সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লান

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মহাবোধি সোসায়টী
কলিকাতা

১৩৫১

প্রকাশক—শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ
মহাবোধি সোসাইটী
৪এ, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভারতবর্ষের সচিব প্রধান পণ্ডিত শ্রীজহরলাল নেহেরু মহোদয় কর্ত্তৃক সারিপুত্ত ও মহামোগ্‌গল্লানের দেহাবশেষ গ্রহণ ও মহাবোধি সভার সভাপতি ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহানুভবের হস্তে সমর্পণের শুভ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে লিখিত। এ ক্ষুদ্রগ্রন্থে প্রকাশিত মতামত লেখকের, মহাবোধি সোসায়টি বা প্রকাশকের মতামত নয়।

লেখক

অগ্নি সঙ্কল্প করেনা অবোধকে দগ্ধ করবার। কিন্তু নির্বোধ স্বয়ং অগ্নিশিখার পরে হাত দেয়, তাই তার দহন অনিবার্য্য। মার, নির্বোধ শিশুর মতো তুমি প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে আত্মসমর্পণ করেছিলে, তাই নিজ দোষে ভস্মীভূত হয়েছ।

—মহামোগ্‌গল্লান

তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা নিরন্তর সাধনা করি। যতটুকু তণ্ডুলকণা মেলে, তাতেই আমাদের তুষ্টি। হস্তী যেমন পর্ণকুটির পদ-দলিত করে, মার এবং তার সাথীদের আমরাও তেমনি দলন করি।

—মহামোগ্‌গল্লান

আকাশে যে রঙ্‌ ফলাতে চায়, তার পরাজয় সুনিশ্চিত। আমারও চিত্ত আকাশের মত শান্ত ও ধীর। অগ্নিকুণ্ডের মুখে ধাবিত পাখীর মত, আমার কাছে তোমার অশুদ্ধ চিন্তা নিয়ে এসো না।

—মহামোগ্‌গল্লান

মহামোগ্‌গল্লান—কমলের অঙ্গে যেমন জলের দাগ পড়েনা, পরিবর্ত্তনশীল জগতও তেমনি তোমার পরে রেখা-পাত করেনা।

—সারিপুত্ত

জগতে তিনি সৎ—যিনি অদৃষ্টের শুভাশুভ বিপাকে আত্মস্থ, অবিচলিত ও স্থির এবং লোভের অভিযান যাঁর ধীর নির্বিকার চিন্তাস্রোতকে প্রতিহত করতে পারে না।

—সারিপুত্ত

যিনি ক্ষণিক আনন্দকে বেদনারূপে চিন্‌তে পারেন, যিনি বেদনার তীক্ষ্ণতা উপলব্ধি করেছেন আর যিনি বুঝেছেন ক্ষণিক সুখ ও ক্ষণিক ব্যথার লীলা-ভূমি এ জীবন চিরস্থায়ী নয়, সংসার তাকে ধরে রাখতে পারেনা, অদৃষ্ট তাঁকে বাঁধতে পারেনা।

—সারিপুত্ত
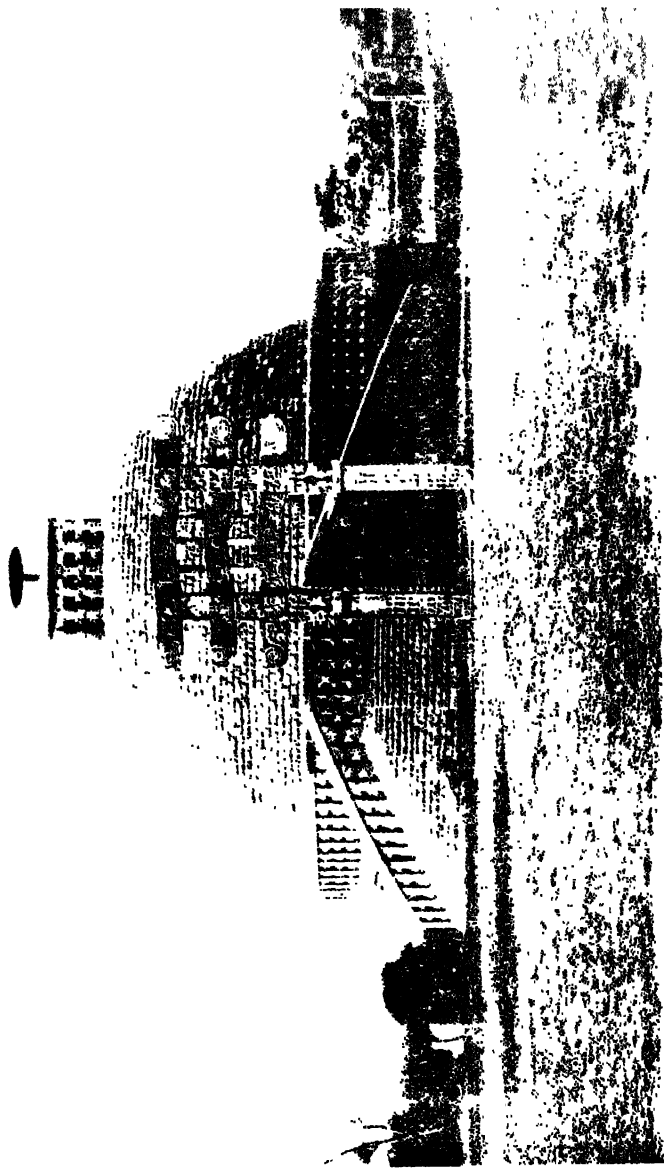
সাঁচির তৃতীয় স্তূপ—ইহারই মধ্য হইতে সারিপুত্র এবং মোগ্গল্লানের দেহাবশেষ আবিস্কৃত হইয়াছে

সাঁচি প্রধান স্তূপ

সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের

সাঁচিতে প্রাপ্ত পবিত্র দেহাবশেষ কথা

সাঁচি

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ
শিলাময় স্তুপ
শিল্প শোভার সার।

অবশ্য সে শিল্পশোভার সার, অতি অপরূপ শিলাময় স্তুপ, এ যুগের লোকের দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ নৃপতি বিম্বিসার ছিলেন ভগবান তথাগতের সমকালের নরপতি, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক।

বুদ্ধভগবানের ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পতাকা বহন ক'রে মগধেশ্বর অশোক ভারতবর্ষকে বিশ্ব-রাজ-সভায় গৌরব মণ্ডিত করে-ছিলেন। সে দিনের শিল্প, সাধনা এবং কৃষ্টির প্রসারের ইতিহাসে সাঁচির স্থান বিশিষ্ট। আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও করুণার

বিস্তার অশোক-জীবনকে উজ্জ্বল করেছিল। সে শুভ অনুষ্ঠানের কর্মকর্ত্তাদের নামের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা অবন্তীর নাম। সাঞ্চী, বিদিশানগর এবং উজ্জয়িনী, অবন্তী গগনের জ্যোতির্ময় তারকা। সাঁচি স্তূপের কথা জাতীয় চেতনায় বহু শুভস্মৃতি জাগিয়ে তোলে। কারণ পুণ্যস্মৃতি গৌতমের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র, মহা মৌদ্গল্লায়ন, কাশ্যপগোত্ত প্রভৃতির ভস্মাবশেষ-স্তূপ-পূত এই প্রদেশ। ভারত-কৃষ্টির প্রদীপ-শিখা সমুজ্জ্বল করেছিল সেদিনের সভ্যজগতকে। সে রশ্মি বিকীরণের অক্ষয়খ্যাতি রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোককে বিশ্ব ইতিহাসে অমরত্ব দান করেছে। বর্ত্তমান সাঁচির ইট ও পাথরের ভগ্নস্তূপ হ'তে অমর অশোকের স্মৃতির আলোক আত্ম-প্রকাশে সচেষ্ট। ভিক্ষু রাজকুমার মহিন্দ, সিদ্ধার্থের সিদ্ধির সমাচারে, সংস্কৃতির ডোরে, সিংহলকে এই পুণ্য ভূমিতে বেঁধেছিলেন। তিনি ও বিদিশগিরির লোক। সাঁচি প্রদেশের ভাঙ্গাস্তূপের আকাশ, বাতাস রাজ-কুমারী সঙ্ঘমিত্রার সগর্ব গৌরবগানে মুখরিত। ইতিহাস এখনও একমত হয়নি এই দুই পুণ্যপ্রাণ ও মহিমময়ী, মহামতি অশোকের পুত্র-কন্যা না ভ্রাতা-ভগ্নী। সসাগরা ভারতের একচ্ছত্র রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের আত্মীয়া সঙ্ঘমিত্রা দীনা ভিক্ষুণীর বেশে বুদ্ধ-গয়ার চিরজীবি বোধিদ্রুমের এক শাখা-তরু নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন। সিংহলের সেদিনের আয়োজন, উৎসব, আনন্দ-সমারোহ আজিও কল্পনায় ভেসে ওঠে। প্রাণ নেচে ওঠে শিহরণে। সঙ্ঘমিত্তা অবন্তী দেশের

কুমারী। তাঁর ধর্ম্মপ্রচারে মরকত-হরিত লঙ্কাদ্বীপের প্রতি ভারতবর্ষের বিশাল-প্রাণের প্রীতির ইঙ্গিত ছিল। সে প্রীতি লক্ষণের প্রতীক অনুরাধপুরের বোধিদ্রুম আজিও সজীব।

ভূপাল রাজ্যে একটি ক্ষুদ্র গিরিগ্রাম সাঁচি। প্রাচীন কালের বিদিশগিরিতে সাঞ্চী ও নিকটবর্ত্তী কটি শৈলে প্রায় ষাটটি স্তূপাবশেষ বিদ্যমান।

সাঁচির সন্নিকটবর্ত্তী পাঁচটি গ্রামে বিক্ষিপ্ত স্তূপমালাকে সাধারণতঃ সাঁচিতুপ বলা হয়। সকলগুলিই ভিলসা বা বহুলস্বামী সহরের আশে পাশে ছয় ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। সাঁচি, সোনালি, শতধারা, পিপলিয়া বা ভোজপুর এবং আঁধের, পাঁচটি গ্রামে ঐ স্তূপগুলি পাওয়া গেছে। এ পবিত্র ক্ষেত্র বৌদ্ধের কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর পুণ্য তীর্থ। কালের সংহার লীলা অনেকগুলি স্তূপ ও স্তম্ভকে ধ্বংস করেছে। পরধর্ম-অসহিষ্ণু নবাব ও রাজপুরুষ বহু স্তূপ ভেঙ্গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদের ঔৎসুক্য যেমন সাঁচি তুপের লুপ্ত-যশকে জাগিয়ে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি কতকগুলিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। পৃথিবীর বহু সংগ্রহশালা এদের লুপ্ত-সম্পদের টুকরায় সমৃদ্ধ। অনেক সময় অজ্ঞ গ্রামবাসীর ইঁট, কাঠ, পাথরের অভাব পূরণ করেছে এই অবহেলায়, অবজ্ঞায় মলিন, প্রাচীন জাতীয় ধন-ভাণ্ডার।

মালবের অন্তর্গত অবন্তী একদিন ভারতবিখ্যাত জনপদ ছিল। শাক্যসিংহের বহু জ্ঞাতি ক্ষত্রিয় সুধী ও বীর কপিলবস্তু

ত্যাগ ক'রে অবন্তীতে উপনিবিষ্ট হয়েছিল। অতি পুরাকাল হ'তে বৌদ্ধমতবাদ ও দেশকে প্লাবিত করেছিল। বিদিশা অবন্তীরাজ্যের একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল।

গৌতমের কতকগুলি বিশিষ্ট শিষ্য অবন্তীদেশের। মহাকচ্চান অবন্তীতে জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা বৌদ্ধ-জগতে সমাদৃত। সুকণ্ঠ প্রচারক সোণ কুটিকণ্ণর জন্মভূমি অবন্তী।

ভারতবর্ষ ও সিংহলের বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত স্তূপগুলি স্মৃতিচিহ্ন। প্রভু বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পর যে ভস্মরাশি দেশ বিদেশে বিতরিত হয়েছিল তাদের ভস্মাধার রক্ষার জন্য কতকগুলির সৃষ্টি। তাঁর বরদেহের দন্ত, কেশ বা পাদনখ-কণা হেম-আধারে রক্ষিত হ'য়ে তার উপর কতক স্থলে স্তূপ নির্ম্মিত হ'ত। লঙ্কার কান্দীমন্দিরে প্রভুর দাঁত আছে। কতকগুলি স্তূপের বুকে বুদ্ধদেবের পার্শ্বদ, শিষ্য বা কীর্তিমান ভক্তের ভস্মাবশেষ রক্ষিত আছে। তেমন পবিত্র আধার সারিপুত্ত এবং মহামোগ্‌গল্লানের। সাঁচিতে দুটি আধারের অন্তরে ঐ দুই পুণ্যাত্মার দেহাবশেষ সঞ্চিত ছিল। আর কতকগুলি স্তূপ রচিত হ'য়েছিল কোনো সবিশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিগত বা জাতীয় ঘটনার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার শুভউদ্দেশ্যে। সারনাথের স্তূপের অভ্যন্তরে কোনো বস্তু পাওয়া যায় নাই। মৃগদাব বা সারঙ্গনাথ বা সারনাথে ভগবান গৌতমের সম্বোধি লাভের পর বৌদ্ধনীতি প্রথম প্রচারিত হ'য়েছিল। বোধ হয়

তাই ঐ স্থলে স্তূপ রচনা করা হয়েছিল—ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের সঙ্কেতরূপে।

রোমক সেনাপতির বিজয় গরিমা চিরস্মরণীয় কর্বার জন্য বিজয়-তোরণ বা স্তম্ভ গঠিত হ'ত। এ-যুগে মনুমেণ্ট, সেনোটাফ প্রভৃতির উদ্দেশ্যও ঐ প্রকার। মিশরের পিরামিড, বিশিষ্ট নরপতি এবং রাজ-পরিবারের সমাধিস্মৃতি। গ্রীক এবং রোমক জাতি প্রস্তর মূর্ত্তি নির্মাণ করত জনপ্রিয়দের। দেব-দেবীর পাষাণ-মুর্ত্তি নির্মাণে বিশেষত্ব ছিল গ্রীক যবনদের। অনেকের অভিমত, তাদের সংস্পর্শে এসে হিন্দু পৌত্তলিকতা শিক্ষা করেছে। অবশ্য এ মতের বিরুদ্ধে বহু কথা বলবার আছে। কিন্তু প্রস্তর মূর্ত্তি গঠনে গ্রীক শিল্পীর অসাধারণ কারু-কুশলতা। অধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র স্ট্যাচুর প্রচলন হয়েছে।

বুদ্ধ-ভগবান

ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর্য্য ঋষি সৃষ্টি ও স্রষ্টার অখণ্ড সম্বন্ধের শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষা কতদূর আপামরসাধারণের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এ সমস্যা নিঃসঙ্কোচে সমাধান করা যায় না। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডে, যজ্ঞের বিবিধ নিয়মকে মন্ত্র ও জ্যামিতির নাগপাশে বেঁধে প্রাণহীন করা হয়েছিল—যাজ্ঞিক পুরোহিতের একনিষ্ঠ সাধনায়।

যে যুগে ভারতবর্ষ কৃষ্টি ও সাধনায় রিক্ত হয়েছিল সেই যুগে এ পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে গৌতম দেশকে ধর্ম্মমার্গে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কেবল ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের সকল ভূখণ্ডকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত কর্বার শুভ ইচ্ছা গৌতমের বাণী।

ক্ষত্রিয়কুলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, শাক্যসিংহ অহিংসার মাহাত্ম্য প্রচার করতে—নরের জন্মগত অধিকারকে মানবতার গণ্ডি এড়িয়ে দেবতার রাজসিংহাসনে বসাতে। সে বাণী ভারতের ও সিংহলের গণসমাজকে পবিত্র ক'রে ক্ষান্ত হল না। বৌদ্ধ-নীতি তিব্বত, চীন, তাতার, মঙ্গল, শ্যাম, মলয়, বর্ম্মা, যবদ্বীপ, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সংস্কৃতিকে সমুজ্জ্বল করলে। সে আলোর রশ্মি দিগদিগন্তে ছুটে প্রাচ্যজগতকে অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদে

সমৃদ্ধ করেছিল। এই বিশ্বব্যাপী প্রচার বুদ্ধ ভগবানের অন্যতম লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য প্রভু বুদ্ধ প্রাচীন আর্য্যরীতি জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের চলতি ভাষাকে ধর্ম্মমতের বাহন করেছিলেন। তাই আজ চীনদেশের বহু বৌদ্ধ হয়তো বুদ্ধ নাম জানে না—তাঁকে ফা, ফায়া বা বুৎস বলে জানে। পৃথিবীর সকল হিন্দুকে সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়, সকল মুসলমানকে আরবী ভাষায় নমাজ পড়তে হয়। বুদ্ধের ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ সংস্কৃত, পালি বা কোন ভারতীয় ভাষায় উপাসনা করতে বাধ্য নয়।

বুদ্ধ ভগবানের বাণী বিজলী বেগে মানুষের হৃদয় হতে হৃদয়ে ছুটেছিল। তার কারণ, সে বাণী মানুষের নিভৃত হৃদয়ের সেই ভাঙ্গা বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়েছিল, যে তারের স্পষ্ট, অস্পষ্ট, ব্যক্ত, অব্যক্ত সুর মানুষের সমাজে সনাতন ও শাশ্বত।

কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস—

এ কঠোর সমস্যা কেভম্যান হ'তে কপিল মুনি পর্য্যন্ত সকলকে নিত্য উত্ত্যক্ত করে। তার সমাধান করতে চেষ্টা করা শ্বাস-প্রশ্বাসের মত জীবনের একটি নিত্য কর্ত্তব্য। শিশুর হাসি, জননীর স্নেহ, কমলের কোমল পেলবস্পর্শ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হিংসার কুম্ভিপাকে আড়ষ্ট হয়। যুগে যুগে, বর্ষে-বর্ষে, ক্ষণে-ক্ষণে, বাহিরের ও অন্তরের স্তোকবাক্য মানুষের এই দুর্ব্বিষহ জীবন সংগ্রামের পথকে সরল ও

করতে সচেষ্ট। কিন্তু জগত নিজের বেখাপ্পা স্রোতে চলেছে, তাই ধরণীতে ত্রিতাপের রাজত্ব অপ্রতিহত।

ভগবান গৌতম একেবারে সোজা সরল অভিযান করেছিলেন ত্রিতাপের দুর্গে। কর্ম্মফলের চক্ররহস্য তিনি শিষ্যদের বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—যদি নির্ব্বাণ চাও, তিন রকম দেহের পাপ ক'র না—হিংসা ক'র না, পরের জিনিষ নিজস্ব ক'র না, পরদার গমন ক'র না। বাচনিক পাপ চার রকম—মিথ্যাবলা—পরনিন্দা—পরকে গালি দেওয়া—আর বৃথা বাক্যালাপ। মানসিক পাপ তিন প্রকার—লোভ—অসূয়া—সংশয়।

সমস্ত বুদ্ধনীতি আলোচনা করবার স্থান বা সময় এ নয়। নিজের সাধনালব্ধ ধর্ম্ম প্রচার করবার উচ্চাশা প্রকট করেছিলেন বুদ্ধ ভগবান। তাই নিরাশায় আশা দিতে, বিক্ষিপ্ত গণশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে, বৈশ্য ও শূদ্রের যে শক্তি অপাংক্তেয় ভেবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপচয় করত—তাকে জনসেবায়, দেশসেবায় নিয়োগ করতে এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা সম্পাদন করতে, বৌদ্ধমত যে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিল, সে কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

নবীন জগত প্রকৃতির অনেক গুপ্তরহস্য অধিকার ক'রে ইন্দ্রিয়ের সেবা গ্রহণ করছে। আকাশে উড়ছে। দেশদেশান্তরে নিমেষে কথা বলে পাঠাচ্ছে। কিন্তু তার মনের শুদ্ধতা বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে ; কারণ সে প্রাচীন অবতারদের বাণী

নিষ্ফল মনে করেছে। তাই নবীন মানুষ বিজলীর বাতি জ্বেলে, পরের ধন অপহরণ করে, উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে নররক্ত পাত করে, বিজলীর সাহায্যে হিংসার মিথ্যা বাণী সারা বিশ্বে প্রচার করে। তাতেও মানুষ তুষ্ট নয়, তার অসন্তোষ ও অসামঞ্জস্য ক্রমবর্দ্ধমান, বিশ্বব্যাপী। বণিকের মত অর্থ নাই রাজার, রাজার সম্মান নাই বণিকের, শক্তি ও কারো অপ্রতিহত নয়। রুশিয়ার গণতন্ত্র প্রভু যীশুকে নির্ব্বাসিত ক'রে লেনিনের মূর্ত্তিপূজা করছে। কিন্তু জীবন তো অশান্ত।

বোধিদ্রুমের স্নিগ্ধছায়ায় ব'সে গৌতম যখন গভীর ধ্যানমগ্ন ছিলেন—রাজশক্তি, বাহুবল, বিজয়লক্ষ্মী, বিদ্যার মোহ, বুদ্ধির মাদকতা—নিশ্চয় একে একে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর বিশ্বমনের স্বচ্ছপটে। তিনি অহিংসা নীতির অমোঘ সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। জরা, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যের জ্বালার প্রতিষেধক ও নিরাময়ক অমোঘ অহিংসার নীতি প্রচার করেছিলেন।

কৃশদেহে, হাসিমুখে এ দেশের অতি-মানুষ গান্ধী এ যুগে বলেছেন—হিংসা নীতি বর্জ্জন কর, তোমার দেশের নীতি জগতকে দান কর। আবার তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে, মহানিশার মহাতিমির ভেদ ক'রে আশার অরুণ ফুটে উঠবে।

সেদিন এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলেছিলেন

"দানবের মূঢ় অপব্যয়,
রচিবে না কোনদিন ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

জগতের জমাট অন্ধকার ও হিংসার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতায় মনে সন্দেহ হয়, বুদ্ধভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ, রামকৃষ্ণ বা গান্ধীর উপদেশ কি বৃথা কথার আড়ম্বর ?

এ সমস্যা যে সন্দিগ্ধ প্রাণকে ব্যথিত করবে, এ সত্য বুদ্ধভগবান উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর দেশের প্রচলিত সংস্কৃতির উপর নির্ভর ক'রে প্রচার করেছিল যে, ক্ষণে ক্ষণে দিনে দিনে মানুষ কর্ম্মের দাস। সেই কর্ম্মকে শম, দম, নিয়মের দ্বারা শুদ্ধ ও সংযত করতে না পারলে, শুদ্ধ-কর্ম্মের প্রেরণা মানুষ অনুভব করবে না। তাই কঠোর শৃঙ্খলা মানুষের মনকে অহিংস, নিরুপদ্রব এবং নিষ্কাম না করলে তাকে নিরন্তর দুঃখ জরা ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। পাপ পুণ্য সম্বন্ধ বাচক। পাপ অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির পবিত্র আগুনে পুড়ে পুণ্যে পর্য্যবসিত হবে।

মানুষের মহত্ব বর্ণনা করেছে বেদ, উপনিষদ, গীতা। বুদ্ধভগবান তাকে যে মহত্ব দিয়েছেন তা অসাধারণ। নিজের চেষ্টাতে মানুষের অন্তিম শুদ্ধি। কিন্তু সেই বিশুদ্ধির অবস্থায় পৌছবার জন্য, বুদ্ধভগবানের পূর্বে, ভারতের ধর্ম ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার মার্গকে উচ্চস্থান দিয়েছে। বুদ্ধ মুক্তি লাভের সমস্ত দায়িত্ব মানুষের নিজের কর্ত্তব্য কর্মের উপর নিক্ষেপ করেছেন। প্রতি পদে সাধনার পথে চলা প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম। নিজেকে উদ্ধার করতে গেলে কেবল জ্ঞানের দ্বারা সে মহা

কার্য্য সাধতে হবে। তিনি অষ্ট মার্গকেই জীবন গোলকধাঁধার আসল চলার পথ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর দর্শনকে মধ্যমার্গ বলে। বিলাসিতায় মোক্ষ মেলেনা, আবার নিজের নিগ্রহেও মুক্তির দ্বার খোলেনা। জরা জীর্ণ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হবে কেমন করে? ধন-বিলাসী বা ভোগীর উন্নতি অসম্ভব। মধ্যমার্গই আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। প্রকৃত দর্শন ও জ্ঞান, সত্যপথে বিচরণের সঙ্কল্প, মিথ্যা, পৌরুষ প্রভৃতি ভাষা বর্জ্জন, হিংসা ও ইন্দ্রিয় ভোগ বিমুখ কর্ম, সদুপায়ে জীবন ধারণ, চেষ্টার দ্বারা অপবিত্রতাকে দমন ও পবিত্রতার উদ্বোধন, প্রকৃষ্ট স্মৃতি এবং ধ্যানে মগ্ন হওয়া নির্বাণ পথে প্রকৃত যাত্রা। মোট কথা চরিত্রের বিশুদ্ধতা মানবের লক্ষ্য হ'লে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। এই তণ্‌হা চায় ইন্দ্রিয়ের সুখ, জন্মলাভের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা। তৃষ্ণা ধ্বংস হলে দুঃখের নিবৃত্তি। বড় ছোট ধনী নির্ধনের ভেদাভেদ অলীক। সিদ্ধার্থ নিজ শিষ্যদের বলেছিলেন—সকল দেশে গিয়ে ধর্ম্ম প্রচার কর। তাদের বলো দীন ও দরিদ্র, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি সবাই এক। সকল জাতি মেলে ধর্মে, যেমন সব নদী মেলে সাগরে। তাঁর শিক্ষা—

মানুষ ব্যবহারে ব্রাহ্মণ হয় জন্মে নয়। বৈরিতা বাড়ে বৈরিতায়। বিজয়ের ফল ঘৃণা কারণ বিজিত দুঃখী।

আত্মোন্নতি আপনারই চেষ্টাতে হতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টার মধ্যে নিহিত—পরের স্বচ্ছন্দতা, অন্যের উন্নতি। সুতরাং পৃথিবী যাক রসাতলে, অন্যে পচুক ভীষণ নরকে আমি মোক্ষ লাভ করি, এ শিক্ষা বৌদ্ধ নীতি নয়।

পঞ্চশীল বৌদ্ধ নরনারীর চরিত্রের আদর্শ নির্ণয় করে। পঞ্চশীল সরল কথায় মানুষকে মোক্ষ-দ্বারের পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার দৈনিক কার্য্যবিধি।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধম্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

১ পাণাতিপাতা বেরমণী শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি

২ অদিন্নাদানা বেরমণী শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি

৩ কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি

৪ মুসাবাদা বেরমণী শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি

৫ সুরামেরময়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি।

ভগবান অর্হত সম্যকসম্বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া, বুদ্ধ, ধম্ম এবং সঙ্ঘর শরণ লইবার অঙ্গীকারের পর, পাঁচটি বিষয় হ'তে বিরত হবার মন্ত্র উচ্চারণ দৈনিক কর্ত্তব্য।

১ প্রাণাভিঘাত হইতে বিরত থাকিব। অর্থাৎ জীবহিংসা করিব না।

২ পরের দ্রব্য অপহরণ হইতে বিরত থাকিব।

৩ ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিব।

৪ মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত থাকিব।

৫ মদ্যাদি পানরূপ প্রমাদ হইতে বিরত থাকিব।

মানুষ যদি সংকল্প করে যে সে প্রাণাতিপাত করবে না, পরদ্রব্য আহরণ করবে না, ব্যভিচারকে কদাচার বোধ করবে, মিথ্যা ভাষণকে শত্রু ভাববে এবং মাদক দ্রব্য পরিহার করবে, তা হ'লে নীতি-পথে তার গতি অপ্রতিহত। এই অঙ্গীকার কথ্য ভাষায় গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং মন্ত্রের রহস্যর মত এ সরল সাধনা শীঘ্র হৃদয়ে পৌঁছে মানুষকে কর্ত্তব্যপথে চালাতে পারে।

দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা মানব মনের সহজ ভাব। কিন্তু সে চেষ্টা ভ্রান্ত পথে নিয়োজিত হয়, তাই দুঃখ বাড়ে তার মূল উচ্ছেদ হয় না। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্ম বুঝতে গেলে, চারটি আর্য্য সত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিষয় উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। চারটি আর্য্য সত্য—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ নিরোধ এবং নিরোধের পথ। ধম্মপদ, বহু সূত্র, গাথা, উদান নিকায়ে এ-বিষয় বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। দুঃখ হচ্চে জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ কষ্ট ও হতাশ।

বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমগ্‌গে বৌদ্ধ-দর্শন বিবৃত করেছেন। ধম্মপদ বহু নীতি কথা সাধারণের বোধগম্য ভাবে বর্ণনা করেছে। বিদেশী বহু পণ্ডিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মর্ম নিজ নিজ ভাষায়

স্বজাতিকে শুনিয়েছেন। ইংরাজিতে রীস্ ডেভিস দম্পতির পুস্তক উপাদেয়। বাঙ্গালী পণ্ডিতদের মধ্যে সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হর প্রসাদ শাস্ত্রী, শরত চন্দ্র দাস, বেণী মাধব বড়ুয়া এবং বিমল চন্দ্র লাহা মহানুভবদিগের শ্রম ও পাণ্ডিত্য ভারতের এক শ্রেষ্ঠ ধন ভাণ্ডার বৌদ্ধ নীতি, সাধারণের জ্ঞানের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। রমেশ চন্দ্র দত্ত, মন্মথনাথ দত্ত প্রভৃতি মনীষির বুদ্ধভগবানের জীবনচরিতও বহুতথ্য সমন্বিত। ঐতিহাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয়ের অসমাপ্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস বৌদ্ধ ইতিহাস, সাহিত্য ও তথ্যে পূর্ণ। অনাগারিক ধর্ম্মপাল প্রতিষ্ঠিত মহাবোধি সোসাইটি বৌদ্ধ-নীতি সুধা বিতরণ কর্ত্তে সদাই সচেষ্ট। ভিক্ষু শীলভদ্রের ধর্ম্মপদ ও দীর্ঘনিকায় আপাততঃ প্রকাশিত হয়েছে। অধুনা সিংহলে ডাক্তার মললশেখর, গুণরত্ন, জয়তিলক প্রভৃতির চেষ্টায় বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতির পরিচয় সুলভ হয়েছে। ১৯২৭ সালে প্রকাশিত ডাঃ টমাসের বুদ্ধচরিত বহু তথ্যে পূর্ণ। সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লানের প্রথম জীবনের ঘটনা তিনি বিষদ-ভাবে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা প্রধান কথা বলি। বিদেশী শিক্ষকের অনুগ্রহে আমরা শুনেছি, বৌদ্ধ-ধর্ম পেসিমিজম বা নিরাশবাদ। শ্রীমতী রিজ ডেভিস এ মত খণ্ডন করেছেন। এবং যে কেহ বুদ্ধভগবান প্রবর্ত্তিত নীতি ও রীতির কথা অবহিত, ধীরভাবে বিচার করলে তাঁকে বলতে হবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম দারুণ

আশাবাদ। জগত দুঃখে ভরা এ কথা সত্যের বর্ণনা। শঙ্করাচার্য্য জগতের ধারার এই আপাতঃ সত্যকে মায়া এবং অলীক বলেছেন। অন্যান্য দার্শনিকরা জগতের দুঃখ স্রোতের অন্য কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে দুঃখের প্লাবন সম্বন্ধে কেহ ভিন্ন মত নন। ভগবান বুদ্ধ উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন কেমন ভাবে জীবন যাপন করলে এই দুঃখের পয়োধি সাঁতারে পার হাওয়া যায়। অন্তে নির্বাণ। মাঝে বহু স্বর্গভোগ। সকল গুলিই সুখের সমাচার, দারুণ আশার বাণী। এ ধর্মমত কেমন ক'রে পেসিমিজম হতে পারে?

সারিপুত্র ও মহামোগ্‌গল্লান

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণতি, বিস্তার এবং প্রচারের ইতিহাসে রাজগিরির খ্যাতি মহিমময়। সেই পবিত্র ভূমিতে দুটি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহে সারিপুত্র এবং মহামোগ্‌গল্লানের জন্ম হয়। এই পরিবার দুটি বহুকাল অখণ্ড আত্মীয়তার বাঁধনে আবদ্ধ ছিল। শিশুকাল হতে সেই দুই কুলের এই সুকুমার দুটির সখ্যও ছিল অকৃত্রিম। বলা বাহুল্য সারিপুত্র শব্দের অর্থ সারিদেবীর পুত্র। তাঁর জননী সারিদেবী। মহা-মৌদগল্য-বংশের হয়তো নামের অপভ্রংশ মহামোগ্‌গল্লান। এ দুজন সাধকের গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল উপতিস্‌স এবং কোলিত। কেহ বলেন কোলিতর জননীর নাম মোগ্‌গল্লী বা মঙ্গলী—তাই তাঁর নাম হয়েছিল মোগ্‌গল্লান। কোনো গ্রন্থে সারিপুত্রর অন্য নাম আছে উপতিস্‌স তাঁর এক সঙ্গীর নাম। এই দুই সখা একত্র খেলতেন। স্বভাবের শোভায় আকৃষ্ট হতেন, আত্ম বিস্মৃত হতেন। প্রকৃতির গাম্ভীর্যে ও লীলা-চপলতার অন্তরে বিশ্বের চরমবাণীর আভাস পেতেন। একই গুরুর গৃহে তাঁরা অধ্যয়ন কর্ত্তেন। শিক্ষাগুরুর নাম সঞ্জয়। একদিন দুইমিত্রে এক নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করতে গিয়েছিলেন। প্রেক্ষা গৃহেই তাঁদের তরুণ মনে জগতের নশ্বরতার বাণী স্বপ্রকাশ
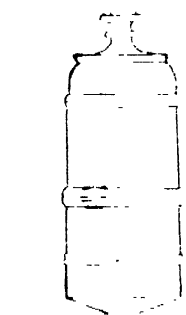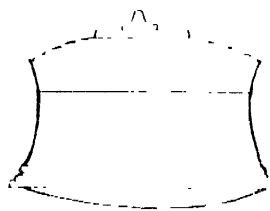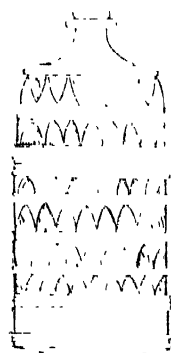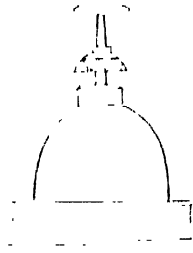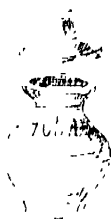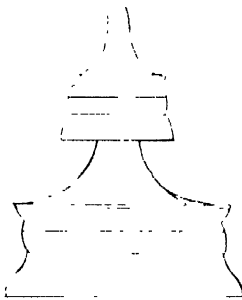
সাচি ও সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি স্মৃতি-কোষ
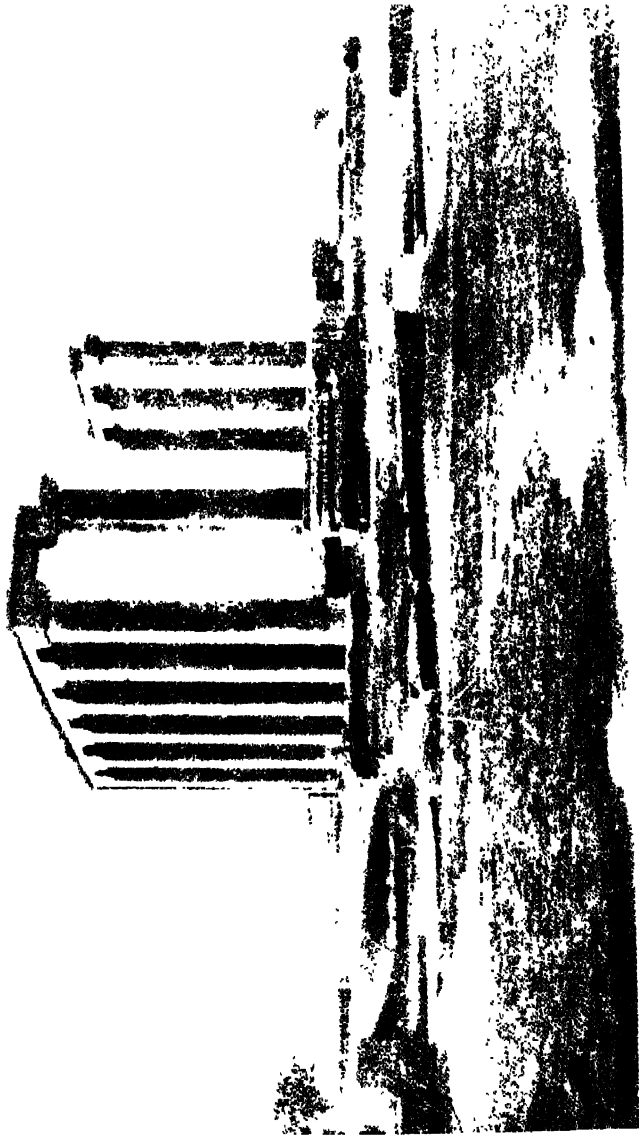
একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

হল। মাত্র সেই নাট্যশালার নটনটীর অভিনয় অলীক নয়। দারা বিশ্ব-সংসারই অভিনয়। ত্রিতাপে তাপিত নরনারী শান্তির দীপ ভেবে আলেয়ার পিছে ছুট্‌ছে কিন্তু পরক্ষণেই বুঝ্‌ছে সে আলোক ক্ষণস্থায়ী। জগত নাট্যশালা খদ্যোতা-লোকের ঝলক দেখিয়েই মানুষকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। দুই তরুণ বন্ধু সঙ্কল্প করলেন সন্ন্যাস গ্রহণের।

গ্রাম ছেড়ে উপতিস্‌স ও কোলিত বনে উপবনে, কত নগরে, তীর্থভূমিতে ও পুণ্যদেশে পরিভ্রমণ করলেন। অথচ এমন কোনো গুরুর সাক্ষাতলাভ হলনা যাঁর বচন-সুধায় অন্তরাত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। তাঁরা নিরাশ হয়ে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

কিন্তু শুদ্ধ আত্মার স্বর ঝঙ্কৃত হচ্চে যাদের চিত্তের গভীর গুহায়, তাদের পক্ষে বিশ্বসংসারের চিরদিনের মান অভিমান আশা-নিরাশা বা ক্ষণিক সুখের পর নিবিড় যন্ত্রণার অভিনয়ে পরিতৃপ্তি নাই। দুই বন্ধু পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত হ'ল তাঁরা দুজনে দু'পথে ভ্রমণ করবেন। যিনি প্রথমে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পাবেন, তিনি অপর বন্ধুকে সে সৌভাগ্যের সমাচার দেবেন।

ঐ সময় গৌতম বুদ্ধ তাঁর সিদ্ধির বাণী ঘোষণা করবার জন্য দেশ বিদেশে ষাটজন শিষ্য পাঠিয়েছিলেন। অস্‌সজী তাঁদের অন্যতম। এই শ্রমণ রাজগৃহে এসেছিলেন বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচার কর্তে। তাঁর শান্ত ধীর মূর্ত্তি, তপস্যা-পূত কান্তি,

জ্ঞানদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু, কুমার উপতিস্‌সকে বিমোহিত করলে। ভক্তি-প্রণত চিত্তে উপতিস্‌স অস্‌সজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কার তরে, সাধু আপনি বৈরাগ্য গ্রহণ করেছেন? কোন্ মহাগুরু আপনাকে দীক্ষা দিয়ে ধন্য করেছেন? কী তাঁর নীতি? আমি জ্ঞান মন্দিরের যাত্রী। কৃপা ক'রে আমাকে সকল কথা বলুন, আমার দারুণ কৌতুহল চরিতার্থ করুন স্বামী।

অর্হত অস্‌সজী তুষ্ট হলেন যুবক তত্ব-জিজ্ঞাসুর আন্তরিকতায়। তিনি অতি সংক্ষেপে সারিপুত্তকে ধর্ম্মের বাণী শোনালেন—

> য়ে ধম্মা হেতুপ্পভবা
> তেসং হেতুং তথাগতো আহ
> তেসং চ য়ো নিরোধো
> এবং বাদি মহাসমনো।

সকল স্বভাবের উদ্ভব, হেতু হ'তে হেতুর কথা বলেছেন তথাগত। সেই কারণগুলির কিরূপে নিরোধ হ'তে পারে তাদেরও কথা সেই মহাশ্রমণ বলেছেন।

জীবনের সকল রহস্য এবং তাদের সমাধানের বাণী লাভের প্রয়াস উপতিস্‌স সারিপুত্রের জ্ঞান-পিপাসা উদ্রেক করলে। সত্যই হেতু বিনা কোনো কর্ম হয় না, বীজ বিনা বৃক্ষ জন্মেনা, বৃক্ষ বিনা ফুল ফোটে না। কামনাই তো সংসারে অতৃপ্তির কারণ। যার আশা নাই তার নিরাশার

সম্ভাবনা কোথা ? যেখানে মেঘ নাই সেখানে বৃষ্টি হয় না। যুবক ভাবলেন—এই পবিত্র সাধুর মহাশ্রমণ আছেন, যাঁর ইনি শিষ্য। মূল হেতু নিরোধের যিনি উপায় নির্দ্ধারণ করেছেন তাঁর দর্শনলাভ হ'তে পারে বহু সুকৃতির ফলে। ঐ বাণীর অন্তর্নিহিত সত্য উপতিস্‌সের সুচিন্তা-পুষ্ট মনকে উত্তেজিত করলে। জীবন অভিনয় হ'তে ত্রাণ পাবার হেতু তো লুকানো রয়েছে এই বাণীতে। মূল হেতু নিরোধ মুক্তির মূল উপায়, মোক্ষ-দ্বারের চাবি।

নিমেষে ভাব-হিল্লোল আঘাত করলে চিত্তের গুপ্ত ভাবভাণ্ডারে। প্রথম চরণ শুনতে না শুনতে উপতিস্‌স সোতাপত্তি দশা প্রাপ্ত হলেন। প্রাক্তন সুকৃতিই এমন ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে ভাবুককে।

উপতিস্‌স সমাচার পেলেন শমণের নিকট মহাশমণের। তিনি সম্বুদ্ধ তিনি করুণাঘন। ক্লিষ্ট মানব সমাজের হিতের জন্য তিনি তাঁর জ্ঞানের দীপশিখা শিষ্যদের হাতে দিয়ে দিগ্‌দিগন্তে পাঠাতে মনস্থ। যে সত্য তাঁকে নির্বাণ দান করেছে সে সত্য তিনি জগতকে দান করতে কৃতনিশ্চয়।

উপতিস্‌স এ সৌভাগ্যের অংশ দিলেন বাল্যবন্ধু, জ্ঞান-পথের সহযাত্রী কোলিতকে। আনন্দ শিহরণে মোগ্‌গল্লানও সোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হলেন। দুই বন্ধুর হৃদয় তখন বিস্তৃতি লাভ করেছে। করুণা ও মৈত্রীর শিক্ষক, বিশ্বজনের বন্ধু, রাজ-পুত্র গৌতমের ধর্ম্মের কথা অপরের কানে তোলবার আগ্রহ

প্রকাশ পেলে এই দুই যুবকের চিত্তে। সঞ্জয় তাঁদের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ছিল তাঁর হাতে। তাঁরা কৃতজ্ঞ। সুখের বন্যা উপ্‌চে ক্ষুদ্র হৃদয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গল্লান তাঁকে এ সমাচার জানালেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ। নূতন গুরু খুঁজে আবার নূতন দীক্ষা নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। নবীন দুজন ভগবানবুদ্ধের সন্ধানে বাহির হলেন।

সিদ্ধার্থ তখন রাজগৃহ রাজ্যের অন্তবর্ত্তী বেণবনে ছিলেন। এঁদের আগ্রহ এবং আন্তরিকতায় তিনি প্রীত হ'লেন। তাঁদের সঙ্ঘে স্থান দিলেন। যুবকেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সেই দিনই নাকি প্রভুর ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনে এই দুই নবীন সন্ন্যাসী ব্যতীত, সেই সঙ্ঘের সকল ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

লোকে সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গল্লান নামেই এই দুই ভিক্ষুকে অভিহিত করত। মোগ্‌গল্লান প্রভুর করুণায় প্রথমেই অর্হত্ব লাভ করেছিলেন, সঙ্ঘ প্রবেশের সাত দিনের মধ্যে। তার এক সপ্তাহ পরে সারিপুত্র অর্হত হলেন। বুদ্ধভগবান সকল শিষ্য একত্র ক'রে সারিপুত্র এবং মোগ্‌গল্লানকে প্রধান শিষ্যত্বের সম্মান দান করলেন। সে সভায় প্রভু বলেছিলেন—

এতদগ্‌গং ভিক্ষবে মম সাবকানং মহা পঞ্‌ঞানং
যদিদং সারিপুত্ত

এতদগ্‌গং ভিক্ষবে মম সাবকানং ইদ্ধিমন্তানং যদিদং মহা
মোগ্‌গল্লানো।

হে ভিক্ষুবর্গ জ্ঞানী ভিক্ষু এই যে সারিপুত্ত একে আমি

ভিক্ষুদের অগ্রণী করলাম। এই ইদ্ধিমন্ত ভিক্ষু মহামোগ্‌গল্লানও ভিক্ষুদের অগ্রণী।

বুদ্ধভগবানের এই দুই যুবককে ভিক্ষু অগ্‌গ মনোনীত করার মূলে ছিল, এঁদের জ্ঞান এবং সাধন মার্গে উন্নত অবস্থা। সারিপুত্তের কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর, প্রভু বুদ্ধের মত। তাঁর ব্যাখ্যা এবং বাণী প্রভুর গভীর স্বর এবং দীপ্ত জ্ঞান স্মরণ করিয়ে দিত শিষ্যদের।

মহামোগ্‌গল্লান ছিলেন ঋদ্ধি-পতি। তিনি অনেক অলৌকিক বিভূতির অধিকারী হয়েছিলেন তপস্যা বলে। তিনি বন্য পশু এবং হিংস্র সর্পকে বশীভূত করতে পারতেন, ইচ্ছামত ছদ্মবেশ গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি অদৃশ্য হ'তে পারতেন, আবার অভিরুচি মত লোক-গোচরীভূত হতে পারতেন। অবশ্য যোগের এ সব বিভূতি নিম্নস্তরের। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান এবং নির্বাণের জ্যোতি এই অর্হতের অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত করেছিল।

দুই বন্ধুর মধ্যে সারিপুত্ত ছিলেন সরল অনাড়ম্বর। মহা মগ্‌গল্লানের কিন্তু শৃঙ্খলার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। সুশৃঙ্খলতা সংযম ব্যতীত অসম্ভব। সঙ্ঘের বন্ধন-রজ্জু নিয়ম এবং শৃঙ্খলা। সঙ্ঘের চরম লক্ষ্য শান্তি। মহামোগ্‌গল্লান চিত্তে সখ্য পোষণ করতেন নিঃসন্দেহ। কারণ সাধক মাত্রেরই হৃদয় মধুময়। কিন্তু তাঁর শাসন ছিল কঠোর। নিয়মানুবর্ত্তিতার উপকারিতা সঙ্ঘ জীবনে প্রচুর। গল্প আছে, এক পূর্বজন্মে যখন গৌতমবুদ্ধ

অনোমদর্শী বুদ্ধরূপে ধর্মপ্রচার করতেন, এঁরা উভয়ে তাঁর শিষ্য ছিলেন। সেই জন্মে এঁদের উচ্চাভিলাষ ছিল, কোনো ভবিষ্যত জন্মে এঁরা বুদ্ধের প্রধান শিষ্য হবেন। সেই জন্মান্তরের বাসনা, সাধনার সুকৃতিতে, সিদ্ধ হয়েছিল তাঁদের সেইদিন যে দিন গৌতম বল্লেন এঁরা ভিক্ষু-অগ্গ।

সারিপুত্ত এবং মহামোগ্গল্লান বহু সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। ধর্মের জন্য তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে নির্য্যাতিত হতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা জানতেন

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

বিদ্বেষ দ্বারা কখনও বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না। দ্বেষ-হীনতার দ্বারাই বিদ্বেষ প্রশমিত হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। একবার সারিপুত্রকে এক ব্রাহ্মণ প্রহার করেছিল। কিন্তু যেমনি তিনি ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে ব্রাহ্মণের প্রতি চাহিলেন, বেচারা অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সারিপুত্তের পদতলে নিপতিত হ'ল। মনে পড়ে শ্রীচৈতন্যের অহিংসার বাণী—মেরেছ বোক্নোর কানা, তা'বলে কি প্রেম দেবনা।

এঁরা বহুদিন প্রাণধারণ করেছিলেন। যে বৎসর বুদ্ধ-ভগবানের মহাপরিনির্বাণ হয়, সেই বৎসর এঁদেরও দেহ-মুক্তি হয়েছিল। অন্তিম দিন আগতপ্রায় বুঝে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন সারিপুত্ত, পুত্রের কর্ত্তব্য কথা স্মরণ করলেন। তিনি সশিষ্য তাঁর নিজগৃহে উপস্থিত হ'লেন। বৃদ্ধা জননীকে তিনি মুক্তি

মার্গের সমাচার দিলেন। করুণাময় মহাযোগী ভগবান বুদ্ধের কথা শোনালেন। ভাগ্যবতী সোতাপত্তি লাভ করলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। মাতার সাক্ষাতকারের পরদিন পুত্র পরিনির্ব্বাণ লাভ করলেন।

মৌদ্গল্যায়নও কিছুদিন পরে দেহ রক্ষা করলেন। যখন তিনি ধ্যানমগ্ন, কোনো দুষ্ট লগুড়াঘাত করলে তাঁর শিরে। দেহ ক্ষত বিক্ষত হল, অস্থি চূর্ণ হল। ধ্যানমগ্ন শমণ, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ, বাহিরের সমাচার সংবাদবাহী স্নায়ু তাঁর মনের গোচরে পৌঁছে দিতে পারলে না—বহির্জগতের সমাচার, দেহের নির্যাতনের নিদারুণ কথা। কিন্তু কর্ম-কারণের বন্ধন অচ্ছেদ্য। দেহের নিয়ম রক্ত মাংস বসা অস্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন ধ্যান ভাঙ্গলো ঋষি দেখলেন দেহ ভেঙ্গেছে। ঋদ্ধির সকল শক্তি নিয়োজিত ক'রে বুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হলেন জরাজীর্ণ শিষ্য। তাঁর চরণে প্রণতির পর, শিশির বিন্দু মহাসাগর সলিলে আত্মসমর্পণ করলো। গেল দেহ, রহিল অক্ষয় কীর্ত্তি যা আজিও মানব মনকে উল্লসিত করে। আজিকার দিনে ঐ ভাবে দেহ-মুক্ত হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী।

সারি পুত্রের অন্তেষ্টি ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়েছিল। বহু রাজা মহারাজা শ্রমণ ও দরিদ্র গ্রামবাসী এই শ্রদ্ধেয় মহাপ্রাণকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্বার জন্য তাঁর চুলিতে সুগন্ধ চন্দন কাঠ দিল, সুবাসিত দ্রব্যের অর্ঘ্য দিল। সুবাসে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত হল। সুরভিত জলে

তাঁর চিতার আগুণ নির্বাপিত হ'ল। ভক্ষু চন্দন ভস্মাবশেষ একত্র ক'রে সে গুলি শ্রাবস্তি নগরে নিয়ে গিয়ে আনন্দের হাতে সমর্পণ করলেন। তাঁরা গন্ধকুটিতে গিয়ে তাঁর প্রিয় শিষ্যর চিতার ছাই প্রভুর হস্তে সমর্পণ করলেন। তিনি সেই শেষ দেহাবশেষ দক্ষিণ করে ধারণ করে বিহারের ভিক্ষুগণকে বল্লেন—পবিত্র সারিপুত্রের দেহাবশেষ অবলোকন কর। তাঁর হৃদয় ছিল দীন, শিশুর মত সরল। নিজের দেহের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। দেহকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি আপনাকে গৃহদ্বারে বিছানো পাপোষ মনে করতেন যাতে সবাই তাঁকে পদদলিত করে যায়। জল যেমন কাকেও ঘৃণা করেনা সকলকে শুদ্ধ করে, তেমনি ছিলেন সারি-পুত্র। বায়ু যেমন কাকেও ঘৃণা করেনা সকলকে ব্যজন করে, তেমনি তাঁর হৃদয় অসীম করুণায় পূর্ণ ছিল। তিনি পরার্থপর ছিলেন, কৃতজ্ঞ ছিলেন, সকলকে সান্ত্বনায় তুষ্ট করতেন। তিনি ক্লিষ্ট, ব্যথিতকে বিশেষরূপে ভালবাসতেন। বিষণ্ণর মুখে তিনি হাঁসি ফোটাতেন। তিনি সবার মিত্র ছিলেন—সবার জননী ছিলেন। তাঁকে তোমরা পূজা করো।

তথাগত তাঁর দেহাবশেষ রক্ষা করলেন জেত কুঞ্জে একটি স্তুপে।

তার এক পক্ষ পরে যখন মহা মোগ্‌গল্লানের দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল, সে দেহাবশেষ তিনি রাজগৃহে একটি স্তুপের মধ্যে রক্ষা করলেন।

বুদ্ধ ভগবানের স্পর্শ ধন্য, সেই দেহাবশেষ পরে সাঁচিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁদেরই উপলক্ষ করে এবৎসর কলিকাতায় উৎসব।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রচারের ইতিহাসে প্রভু বুদ্ধের এই দুটি প্রধান শিষ্যর গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে ও সাহিত্যে। যখন গৌতমের পুত্র রাহুল পিতার নিকট পরমধন-দাবী করলেন উত্তরাধিকারী সুত্রে, প্রভুবুদ্ধ সারিপুত্তকে আদেশ দিলেন রাহুলকে দীক্ষা দিতে। পটাচারী নামক একজন কুমারী প্রচার করেছিলেন, যদি কোন গৃহী যুবক তাঁকে তর্কে হারাতে পারেন তিনি তাঁকে বিবাহ করবেন, আর যদি কোনো সন্ন্যাসী তাঁকে তর্কে পরাজিত করতে পারেন, তিনি সন্ন্যাসিনী হবেন। সারিপুত্র তাঁকে পরাভূত করেছিলেন। কুমারী পটাচারী সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। উক্ত আছে যখন বুদ্ধভগবান তিন মাস স্বর্গে অভিধম্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন সে সময় সারিপুত্ত এবং মহামোগ্‌গল্লান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা সমাচার এনেছিলেন যে প্রভু সাবত্থির সন্নিকটে সংকস্‌স নামক স্থানে অবতরণ করবেন। সারিপুত্র এবং মহামোগ্‌গল্লানের প্রচার শক্তির উপর ভগবানের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। তাঁর শরীরের জীর্ণতার ব্যথায় এঁরা প্রভুর দেহসেবা করতে চেয়েছিলেন। সঙ্ঘের কর্ম্ম শিথিল হবার ভয়ে তিনি এঁদের সেবা গ্রহণ করেন নি। সে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন আনন্দ। যমক নামক

এক শিষ্য যখন ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিকৃত করছিলেন সারিপুত্ত তাঁকে প্রকৃত পথের সন্ধান দেন।

পিণ্ডপাত পরিসুদ্ধি সুত্তে উক্ত হয়েছে যে সঙ্ঘে শিষ্যকে কিরূপে পূর্ণ জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে ভগবান তথাগত সারিপুত্তকে সে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সুত্ত সেই উপদেশে পূর্ণ।

বুদ্ধবংশ নামক গ্রন্থে গৌতমবুদ্ধের প্রাক্তন ২৪ জন বুদ্ধের কথা এবং তাঁর নিজের সম্বোধি লাভের ইতিহাস বর্ণিত আছে। এ সব কথা তিনি বলেছেন সারিপুত্তের প্রশ্নের উত্তরে।

সারিপুত্তের সিংহনাদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি সিংহনাদে বলেছিলেন—হে প্রভু, প্রভুর প্রতি আমার প্রভূত ভক্তি। এমন কেহ কখনো ছিলেন না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও এমন দ্বিতীয় শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মাবেন না যিনি সম্বোধির পথে আমার প্রভু অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।

মোগ্‌গল্লান ঋদ্ধি পতি ছিলেন। কিন্তু তাঁর ঋদ্ধির ফলে অঘটন ঘটাতে দিতেন না ভগবান। জীবনের ধারা পরিবর্ত্তনের উপায় সাধনা। একবার দুর্ভিক্ষের সময় মহামোগ্‌গল্লান যোগবলে খাদ্য সংগ্রহের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু প্রভু তাঁকে বিরত করেন। ভিক্ষুরা অন্যদেশ হতে ভিক্ষা ক'রে বুভুক্ষুর সেবা করেছিলেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে মোগ্‌গল্লান এবং সারিপুত্তের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বহু তথ্য বিবৃত হয়েছে। মোগ্‌গল্লান

সাধনার ফলে বহু পারলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করেছিলেন। মজ্‌ঝিম নিকায়তে বর্ণিত হয়েছে যে ইন্দ্র তাঁকে বৈজয়ন্তী প্রাসাদ নির্ম্মাণের সমাচার দিয়েছিলেন। ঐ প্রাসাদ দেবাসুর যুদ্ধে, অসুরদের পরাজয়ের পর, নির্ম্মিত হয়েছিল। তার একশত চূড়া ছিল, সাতশত কুঠাগার ছিল—ইত্যাদি।

অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, যে কোন্ কোন্ সৎকর্মের অনুষ্ঠানে কিরূপ স্বর্গলাভ হয় সারিপুত্ত সে সমাচার দিয়েছিলেন। দানকরা বস্তুতে আসক্তি রেখে পরকালে ভোগ এবং অর্থের লোভে যে দান করা হয়, তাতে মাত্র চতুর্ম্মহারাজিক দেবতাদের স্বর্গে কিছুদিনের জন্যে বাস করা যায়। কিন্তু যারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের পূর্ণ ভক্তি ও আনুগত্য অর্জ্জন করেছে তারা সম্বোধি লাভের উপযুক্ত।

প্রথম যুগের বৌদ্ধদের মধ্যে মহামোগ্‌গল্লান প্রসিদ্ধ থের ছিলেন সে বিষয় বহু গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বিমানবত্থু সংহিতার এক কাহিনী এই যে যখন বুদ্ধভগবান রাজগিরে বাস করতেন তখন এক উপাসক এবং তাঁর কন্যা মহামোগ্‌গল্লানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এক দিন ভিক্ষুকে ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতুষ্ট ক'রে, উপাসকের কন্যা দেহত্যাগ করেন কারণ তাঁর কর্মের অন্ত হয়েছিল। তিনি তাবতিংস (ত্রয়োত্রিংশ) স্বর্গে স্থান পেয়েছিলেন। এ কাহিনীগুলি শ্রদ্ধা নিবেদন।

ঐ গ্রন্থে একটি নারীর কথা আছে। তিনি একটি ভিক্ষুকে সুমন পুষ্প উপহার দিয়েছিলেন। সে পুণ্যে তিনি স্বর্গের

অপ্সরা হয়েছিলেন। পরে স্বর্গে মহামোগ্গল্লানের মুখে ধর্ম্মের বিবৃতি শুনে উচ্চতর পবিত্রতা লাভ করেছিলেন।

মহামোগ্গল্লান স্বর্গে এক শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে এক দেব-পুত্তুর দেখেছিলেন। কি সুকর্ম ফলে তাঁর এমন উত্তম দশা হল একথা জিজ্ঞাসা করলেন মহামোগ্গল্লন। বুদ্ধ দেবের আবির্ভাবের পূর্বে কশ্যপ বুদ্ধের এক স্তুপ ছিল কাশীতে। কাশীশ্বর কিকী প্রত্যহ রাশি রাশি ফুলের অর্ঘ্য দিতেন স্তুপপাদ মূলে। দেশে পুষ্প অতি বিরল হ'ল। সেই উপাসকটি বহু যত্নে মাত্র আটটি ফুল সংগ্রহ ক'রে স্তুপে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। সেই পুণ্যে তিনি স্বর্গে দেবপুত্র হ'য়ে শ্বেতহস্তী আরোহণের অধিকার লাভ করেছিলেন।

সংযুক্ত নিকায়ে উক্ত হয়েছে সারিপুত্ত ও মহামোগ্গল্লানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য কোমাবিক নামক এক ভিক্ষুকে পদুমনিরয় নরকে বাস কর্ত্তে হয়েছিল।

মোট কথা, যে দুটি ভিক্ষুর অবশেষ স্তুপে প্রত্যর্পণের উৎসব হ'বে, বৌদ্ধ ইতিহাসে তাঁদের স্থান উচ্চে। বিমান-বত্থুতে সারিপুত্ত সম্বন্ধে অলৌকিক শক্তির কথা আছে। এক শেঠের পত্নী তাঁকে ভোজন করিয়ে ঐশ্বর্য্য লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সেবা পুণ্যকর্ম একথা বলা হয়েছে।

অশোক

সাঁচির সঙ্গে মৌর্য্য বংশের রাজ-চক্রবর্ত্তী মহামতি অশোকের স্মৃতি বিজড়িত। সাঁচি বা ভারতবর্ষ কেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রিয়দর্শী অশোকের সাম্রাজ্যকাল এক স্মরণীয় যুগ। দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব এশিয়া এক অনন্ত কৃষ্টির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে অশোকের দূরদৃষ্টি এবং প্রিয়দৃষ্টির অনিবার্য্য ফলে। অশেষ জাতির মানব বাস করে পৃথিবীর এ ভূখণ্ডে। নানা ভাষা ও সামাজিক রীতি এদের পৃথক করে রেখেছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু চীন হ'তে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সকল দেশের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে সবার মাঝে এক মূল সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সুর অহিংসার সুর, বৌদ্ধ নীতির সুর। মানুষ কোনো দিন আদর্শের সঙ্গে চরিত্রের সামঞ্জস্য করতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্যের ইতিহাস আলোচনা করলে বোঝা যায়, ভারত, শ্যাম, বর্মা, সিংহল বা তিব্বত আধুনিক জড়বাদের চাক-চিক্যে ক্ষণিকের তরে দৃষ্টি হারাবার পূর্ব্বে, ভদ্র সচ্চরিত্র নিরুপদ্রব লোকের বাসস্থান ছিল। জাপান একটু দ্রুত পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিক হয়েছিল, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিনও এসে পড়েছিল দ্রুত। এই নিরীহ নিরুপদ্রব সভ্যতার কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম। তার বিস্তারের যশ সম্রাট অশোকের। মানুষ প্রভু যীশুকে যত শীঘ্র জীবনের উৎস মূল হতে সরিয়েছে

বুদ্ধভগবানকে তত শীঘ্র ভুলতে পারেনি। ভারতবর্ষে বুদ্ধোত্তর যুগে মহাত্মা গান্ধী অবধি বহু মহাপুরুষ বিভিন্ন কালে অহিংসা, নীতি পথ, পুনর্জন্মবাদ এবং কর্মফলের প্রভাবের কথা শিক্ষা দিয়েছেন। ভারতের বাহিরের কথা ছেড়ে দিলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ অশোকের পূর্বে কোনো দিন এক রাজছত্রের তলায় সংহত ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

অসংখ্য বিহার, স্তুপ, স্তম্ভ, এবং স্তম্ভ-লিপি এ যুগের লোকের হস্তগত হয়েছে। তাদের মধ্যে বহুলাংশ অশোক যুগের সৃষ্টি। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী তাঁর শিলালিপি। কতকগুলি স্তম্ভ এবং শিলাখণ্ড আজিও বর্ত্তমান, যারা বক্ষে ধরে আছে প্রায় বাইশ শত বৎসর রাজ্যেশ্বর অশোকের অনুশাসন। রাজা প্রজার সম্পর্কের কথা, মানুষের হৃদয়ে কেমন মৈত্রীর ভাব বিরাজ করবে, পশু পক্ষীর প্রতি কেমন ব্যবহার সুষ্ঠু সে শিক্ষা, কেমন কৃপা চিত্তে তাঁর প্রজাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করতে হবে সে উপদেশ। বলা বাহুল্য এসব লিখিত উপদেশ সকল দেশে, সকল যুগে, সকল নরনারীর পক্ষে হিতকর। এতদ্ব্যতীত অশোক শিলা হতে সে কালের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নিত্য আচরিত কর্মধারার অমোঘ সন্ধান লাভ করা যায়।

মৌর্য্যবংশীয় সুবিখ্যাত বীর-কেশরী রাজা চন্দ্রগুপ্তর পৌত্র মহারাজা অশোক। তাঁর পিতা রাজা বিন্দুসার নিজ জনকের

পদাঙ্কানুসরণ করে শান্তিতে রাজ্য শাসন করতেন। মৌর্য্য সিংহাসনের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন পণ্ডিত চাণক্য। বিশ্ব-বিজয় হ'তে আত্ম-বিজয় অবধি সকল বিষয়ে সাফল্যের সূত্র চাণক্য পণ্ডিতের অমর মস্তিষ্ক উদ্ভাবন করেছিল।

অশোক সম্বন্ধে বহু কাহিনী আমরা শুনি। তাদের মধ্যে কোন্‌টি ঐতিহাসিক সত্য আর কোনটি কাল্পনিক ইতিকথা, তা বোঝবার কোনো উপায় নাই। সাম্রাজ্যবাদীরা, জড়বাদী সভ্যতার পোষক লোকপাল বা ভূপতিরা, আপনাদের কীর্ত্তিকথা সজীব রাখবার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ভারতবর্ষ সে প্রথা কোনো দিন অনুসরণ করেনি। তাই আধুনিক কৃষ্টির মানে কোনো দিন ইতিহাস প্রস্তুত করতে যত্নবান হয়নি ভারতবর্ষের পণ্ডিত শ্রেণী। অধিকাংশ ইতিহাস সিংহের নিজের তুলিকায় অঙ্কিত তার আপনার চিত্র। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো লিখিত পুঁথিতে সমসাময়িক বীরের বিষয় লেখা নাই, তার অদম্য সাহস কত বিধর্ম্মীর মুণ্ডপাত করেছিল, কত দেবমন্দির ধ্বংস করেছিল, শত্রুর শোণিতস্রোতে কত রক্তনদীর উৎসে ধরাতল রঞ্জিত করেছিল। কিন্তু মহামানব-পূজার প্রবৃত্তি মানব মনের সহজ উপাদান যেমন অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা বা হিংসা সহজাত বৃত্তি। তাই পূজনীয় এবং ঘৃণ্য উভয়কে ঘিরে নানা গল্প ও ইতিকথা ঐতিহ্যরূপে বংশ পরম্পরায় বিস্তার লাভ করেছে। কথকের কল্পনা, সত্য নিষ্ঠা, রসিকতা তাদের উপর রঙ্‌পরঙ্‌ চাপিয়েছে।

কাজেই প্রথাটা মারাত্মক। স্তাবকের স্তুতি এবং নিন্দুকের নিন্দা উভয়েই সত্যানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত আলোচনার ঐ বিপদ। বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদের অপরিশ্রান্ত অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং জ্ঞান পিপাসা বহুদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত উদ্ধারে যত্নশীল। কিন্তু সে পণ্ডিতদের সাফল্যের কতকগুলি অন্তরায় ছিল। তাঁদের যৌবনের শিক্ষার মূল বিষয় গ্রীক ও লাটিন মাহাত্ম্য। যবন ও রোমক সভ্যতার ঐতিহ্য তাঁদের নিজেদের সমাজের ভিত্তি এবং আদর্শ। যে ভারতবর্ষকে তাঁরা দেখেছিলেন সে দেশে দ্বন্দ্ব কোলাহল অজ্ঞতা এবং দাসত্ব অবাধে মানুষকে অধঃপাতে যাবার সহায়তা করেছিল। অধঃপতিত ভারতবাসীর কোনো পূর্বপুরুষ জ্ঞানে, ধর্মে, শিল্পে বা সাহিত্যে নূতন কোনো দানে জগৎকে তুষ্ট বা উন্নত করতে পারে, এ ধারণা প্রায় অসম্ভবতার গণ্ডীর ধারে গিয়ে পৌঁছেছিল। তার উপর গ্রীক-কমপ্লেক্স। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা দেখতেন যাবনিক গুরুগিরি। তারিখ সম্বন্ধেও বেদ প্রভৃতির অতি প্রাচীনত্ব বিশ্বাস করেননি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত।

অশোকের রাজত্বকালের সময় নিরুপণ সম্বন্ধেও নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কোন্ মত ভ্রান্ত, কোন্‌টি অভ্রান্ত, সে সম্বন্ধে রায় দেবার মত শক্তি বা সামর্থ্য আমার নাই। তাই নিম্নে একটি তালিকা দিলাম।
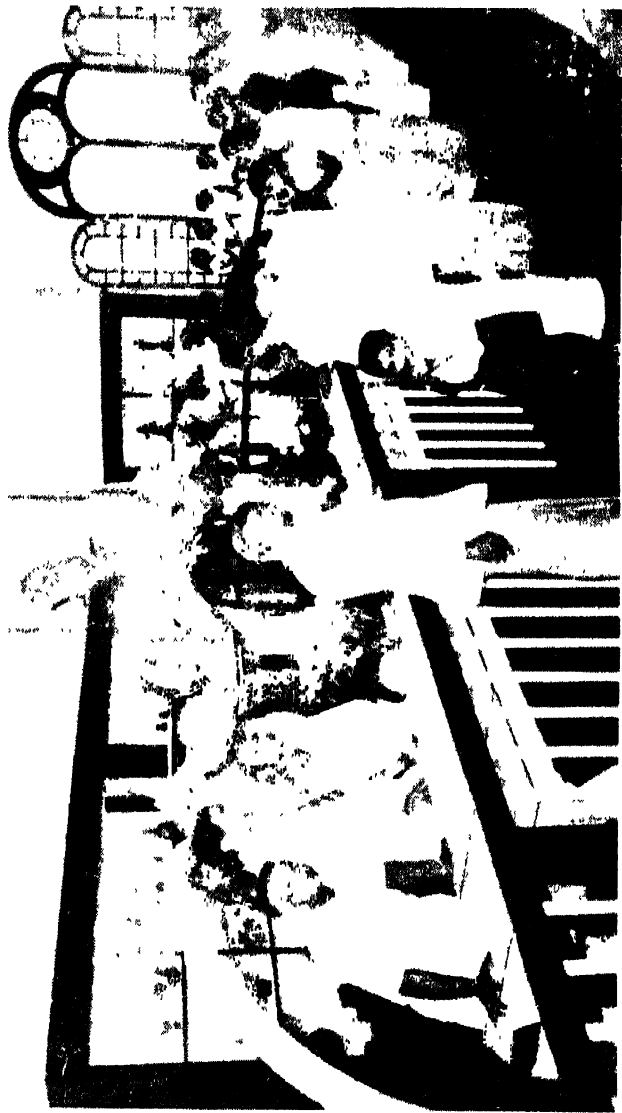
সিংহলের বৌদ্ধগণের সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের পবিত্র অবশেষ দর্শন
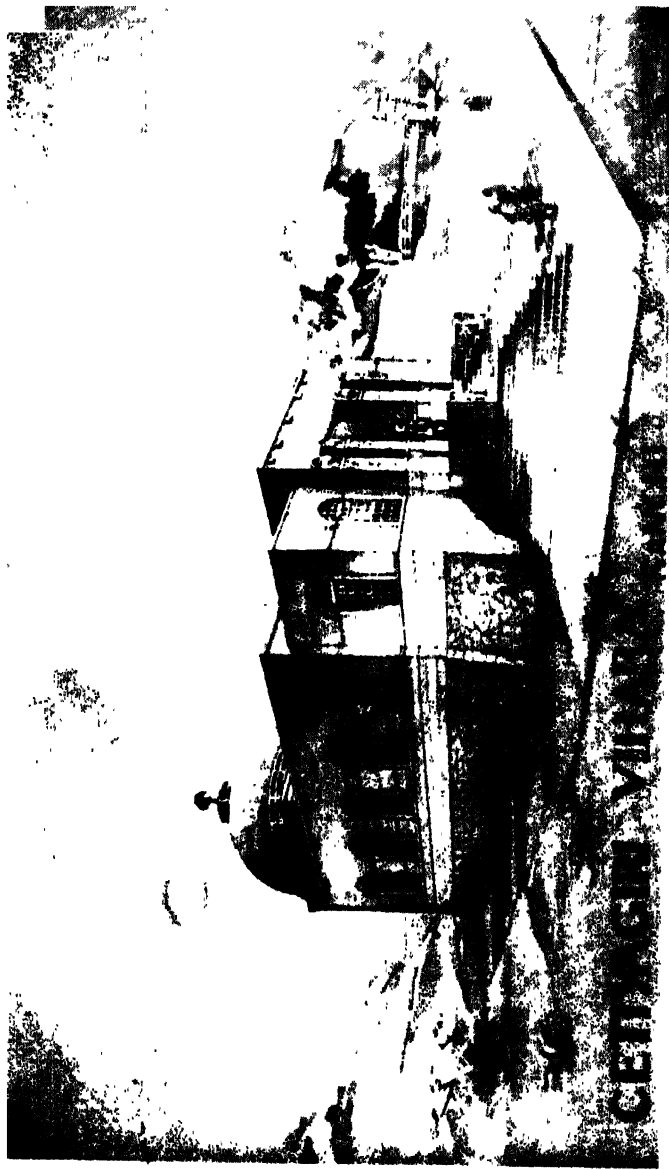
প্রস্তাবিত চৈত্যগিরি বিহার—যথায় ভস্মাবশেষ রক্ষিত হবে, প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে

	বুদ্ধভগবানের মহাপরিনির্বাণ	চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক	অশোকের রাজ্যাভিষেক
কানিংহাম	৪৭৮ খৃঃপূঃ	৩১৬ খৃঃপূঃ	২৭০ খৃঃপূঃ
মাক্সমুলার	৪৭৭ খৃঃপূঃ	৩১৫ খৃঃপূঃ	২৫৯ খৃঃপূঃ
ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ	৪০৩ খৃঃপূঃ	৩২২ খৃঃপূঃ	২৬৮ খৃঃপূঃ
ফ্লীট	৪৮৩ খৃঃপূঃ	৩২১ খৃঃপূঃ	২৬৫ খৃঃপূঃ
সিংহলী মত	৫৪৩ খৃঃপূঃ	৩২২ খৃঃপূঃ	২৬৫ খৃঃপূঃ
রমেশ দত্ত	৪৭৭ খৃঃপূঃ	৩২৩ খৃঃপূঃ	২৬০ খৃঃপূঃ
ডাঃ টমাস	৪৮৩ খৃঃপূঃ	৩২২ খৃঃপূঃ	২৬৯ খৃঃপূঃ
পণ্ডিত নেহেরু	৫৪৪ খৃঃপূঃ	৩২১ (?)খৃঃপূঃ	২৭৩ খৃঃপূঃ

একশ্রেণীর ভক্ত আছে যারা আরাধ্যের উন্নত জীবন লাভের পূর্বের অবস্থাকে অতি ভীষণ ভাবে বর্ণনা করে। অশোকের ধর্ম্মান্তরের পরের অবস্থা এবং পূর্বের অবস্থা, বিজ্ঞাপনের ঔষধ সেবনের পরের অবস্থা এবং পূর্বের অবস্থার তুটি চিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটা উদাহরণ দিই, ভারতের মহা এবং হীনযান উভয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের নামে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তারা ভালবাসে বৌদ্ধ অশোককে। তাই এক সিংহলী ইতিহাসে উক্ত হয়েছে যে তাঁর ধর্ম্মান্তরের পূর্বে অশোক এত ভীষণ নিষ্ঠুর ছিলেন যে তিনি তাঁর নিরানব্বইটি ভাইকে হত্যা করেছিলেন। অথচ তাঁর এডিক্‌টে ও শিলালিপিতে আমরা পিয়দশীর ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃ নামের উল্লেখ পাই। এই এক কম একশতটি নিহত

রাজপুত্রের পর বাকীগুলি এলো কোথা হ'তে? নেপালী সাহিত্যের আশোক অবদান এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তার মতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পূর্বে নিষ্ঠুর অশোক বহু রাজ কর্মচারী, সেনা-নায়ক, তাদের ভার্য্যা এবং বহুলোককে বিচিত্র কঠোরতার পরিকল্পনার ফলে নিহত করেছিল। বলা বাহুল্য এ সব গল্প অলীক এবং ভিত্তিহীন।

প্রিয়দর্শীর ধর্ম গ্রহণের কাল সম্বন্ধেও ঐতিহাসিক মুনিরা একমত নন। তাতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের সত্যের প্রতি অনুরাগ সূচিত হয় কিন্তু সাধারণ পাঠক গবেষণার গোলক ধাঁধায় পড়ে। অবশ্য সময় অনন্ত। বৎসর মাস এবং তিথি কী করে?

মোট কথা রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক যে কীর্ত্তি রেখে গেছেন তা দেশ কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে আজিও সমগ্র এসিয়াকে শিহরিয়ে তোলে। তাঁর পূর্বে এবং পরে বহু রাজা এবং অনেক জাতি বিশাল সাম্রাজ্য রচনা করেছে। তাঁর সমকালে পিউনিক যুদ্ধের রক্ত স্রোতের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যর ভিত্তি দৃঢ় করছিল রোম। আন্তিয়ক যোন রাজা সিংহাসন রক্ষার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করছিলেন। ডিওডোটাসের বিদ্রোহে সিরিয়ার অধীনতা হতে মুক্ত হয়ে বাক্‌ত্রিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু প্রেমের বন্ধনে, অহিংসার মন্ত্রে, বহুজাতি, বহুদেশ, বহুস্তরের সভ্যতাকে এক কৃষ্টি ডোরে বেঁধে, এক অতি মহান বিরাট আদর্শকে মহারাজা অশোক প্রাণবন্ত করে

ছিলেন। জগতের অপর কোনো নেতা সেরূপ কার্যে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এ যুগে যে রাষ্ট্রনীতির জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন রাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক সে যুগে প্রমাণ করেছিলেন তার সজীবতা, তার সাফল্যের সম্ভাবনা। তাই মনে হয় মানবজাতির মুক্তির মন্ত্র কারুণ্য, মৈত্রী, অহিংসা।

কিন্তু অশোকের অসাধারণ সাফল্যের মূল কারণ ভুললে চলবে না। অশোক মাত্র যন্ত্র ছিলেন। যন্ত্রী ছিলেন ধ্যান-গম্ভীর, করুণাঘন, বিশ্ব-প্রেমিক, সত্যদর্শী, ভিখারী রাজপুত্র—ভগবান বুদ্ধ। থেরীগাথায় মাতা গোতমী কৃত বন্দনা মর্মগ্রাহী। নিশ্চয় তারই মত অশোক বুঝেছিলেন—

সব্বদুক্‌খং পরিঞ্ঞাতং হেতুতণ্‌হা বিসোসিতা।
অরিয়ঠঙ্গিকো মগ্‌গো নিরোধো ফুসিতোময়া॥

সর্ব দুঃখের হেতু পরিজ্ঞাত। তণ্‌হার হেতু শুষ্ক হয়েছে দুঃখের নিবৃত্তিদায়ক আর্য্য অষ্টাংঙ্গমার্গ আমি জেনেছি।

এই তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য অশোকের আরও ভূখণ্ড জয় করবার বাসনা ছিল না। সাফল্য আরও সাফল্যের তৃষ্ণা বাড়ায়। তাঁরই মত এক দিগ্বিজয়ী সম্রাট দুঃখ করেছিলেন যে তাঁর জয় করবার আর দেশ নাই। এই খানে অশোকের শোকহীনতা। বিগতস্পৃহ ব্যক্তিই অশোক হ'তে পারে, সে রাজাধিরাজই হক আর পথচারী ভিখারীই হক। বুদ্ধবীরের অমোঘ নীতিই ভারত ভুবনেশ্বরকে ভিক্ষু করতে পেরেছিল।

আমাদের সাঞ্চী প্রসঙ্গে মহারাজা অশোকের সমস্ত কার্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর সুকর্মরাজি পরস্পরের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে গ্রহিত যে সংক্ষেপে তাদের উল্লেখ আবশ্যক।

মহামতি প্রিয়দর্শী সাইবেরিয়া হতে সিংহল অবধি অসংখ্য বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। মগধাধিপতি অশোক নিজের রাজধানীর আশেপাশে এত বিহার রচনা করেছিলেন যে এই প্রদেশের আজিও নাম বিহার। অবশ্য বুদ্ধ-গয়া, রাজগৃহ, সহসারাম প্রভৃতি পাটলিপুত্র হতে অধিক দূর নয়।

বহু গুহা, গুম্ফা, সঙ্ঘ, বিহার এবং স্তূপে প্রিয়দর্শী মগধাধিপতি শিলা-ফলকে তাঁর আদর্শ এবং কতক কতক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উৎকীর্ণ করেছিলেন। সাধারণের বোধগম্য করবার জন্য অশোক সেগুলিকে তদানীন্তন কালের প্রচলিত বর্ণমালায় প্রচলিত ভাষায় লিখেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর পূর্ব-যুগের কোনো বর্ণমালা এযুগের লোকের হস্তগত হয়নি। অতি সংক্ষেপে কতক গুলি অনুশাসনের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বরং বৌদ্ধ-দর্শন বোঝবার পক্ষে সেগুলি সহায় হবে।

প্রথম গিরিলিপি তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ সালে উৎকীর্ণ হয়। অন্যান্য অনুশাসনের মধ্যে কথিত হয়েছে ইষ ন কিংচি জীবং আরভিতপা প্রজুহিতব্যং ন চ সমাজো কর্ত্তব্যো।

অর্থাৎ যজ্ঞে কেহ পশু হত্যা করিতে পারিবেনা বা পশু দেহ লইয়া হোম করিতে পারিবে না কিম্বা সামাজিক উৎসবে পশু হত্যা করিতে পারিবে না।

উক্ত আছে তাঁর নিজের রন্ধনশালায় পূর্বে বহু জীব হত্যা হ'ত। তিনি ক্রমশঃ কমিয়ে দুইটি ময়ুর এবং একটি মৃগ বরাদ্দ করেছিলেন রন্ধনশালার জন্য। সেই অনুশাসন প্রচারের সঙ্গে তাহাও বন্ধ হয়েছিল।

তিনি নিম্নলিখিত রাজ্যে দুইটি করিয়া চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটি পশু চিকিৎসার জন্য অন্যটি মনুষ্য চিকিৎসার জন্য—নিজ রাজ্যের সর্বত্র, প্রত্যন্ত এবং সীমান্তবর্ত্তী চোল (ত্রিচিনপল্লী যার রাজধানী) পাণ্ড্য (মাদুরা), কেরল, সতীয় পুত্র, তাম্রপর্ণী (লঙ্কা), আন্তিয়োকের যোন রাজ্যে এবং তার অধীনস্থ রাজ্যে।

"মনুস চিকিছা" বা "পশুচিকিছার" ব্যবস্থার জন্য তিনি সর্বত্র রোগ প্রতিকারক ফলমূলাদি সংগ্রহ করে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়েছিলেন। রাজপথ ছায়া শীতল বৃক্ষাদিতে শোভিত করেছিলেন এবং কূপখনন ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সকল অনুশাসনের পরিচয় দেওয়া এ প্রসঙ্গে অসম্ভব। মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবে দয়া এবং পর-ধর্ম-সহিষ্ণুতার পোষক ছিলেন অশোক। এ নীতি ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের জাতীয় জীবনকে অতি-মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত

করেছে। তাই যন্ত্র অশোক এবং যন্ত্রী বুদ্ধ আজিও আমাদের চিত্তে বিরাজিত।

স্তম্ভে উৎকীর্ণ অনুশাসন দুইটি দিল্লিতে একটি এলাহাবাদে এবং একটি সাঁচিতে পাওয়া গেছে।

কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য যে যুদ্ধ হয়, তাহার করুণ দৃশ্যই অশোকের চিত্তে অহিংসার হিল্লোল তুলেছিল। সুসময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার একটি অনুশাসনে সম্রাট বলেছেন—

এখন আমি ধর্ম্মসেবা করছি। তার ফলে রণ দুন্দুভি নীরব হয়েছে—ধর্ম্মের সঙ্গীতই এখন শোনা যাচ্চে।

ত্রয়োদশ গুহা অনুশাসনে উক্ত হয়েছে—

আমার পুত্র, পৌত্র, প্র-পৌত্র যারা জন্মিবে, তারা আর নূতন দেশ জয় করবে না।

এ বিষয়ে আরভিঙ্‌ বব্বিটের কবিতার একটি চরণ বড় মর্ম্মস্পর্শী।

আমার রথে আর শোণিত মাখা চাকা ঘুরবে না
বিজয় হ'তে বিজয়ে।

রলিনসন তাঁর লেগাসি অফ্‌ ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকে বলেছেন যে তিনি যবন ভূপতি অন্তিয়কস্‌, মিশরের গ্রীক টলেমি ফিলডেল্‌ফস্‌, মাসিদোনের অন্তিগণ গোণাতস্‌, সাইরিনের মগস্‌, এপিরাসের আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির নিকট দূত পাঠিয়ে ছিলেন। সে সব জনপদে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার

উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। এ মৈত্রীর মূলে ছিল জগতের শান্তি। বিশ্ব শান্তির চেষ্টা একালের নূতন পরিকল্পনা নয়। অহিংসা মন্ত্রের সাধক ভারতেশ্বর অশোকের সূক্ষ্মদৃষ্টি বিরোধের ভীষণ পরিণাম উপলব্ধি করেছিল। তাই তাঁর বহুদর্শিতা চেয়েছিল সমকালের সকল বিজয়কামীদের বাসনা সংযত করতে।

লর্ড জেটলাণ্ড ল্যাণ্ড অফ দি থাণ্ডারবোল্ট গ্রন্থে বলেছেন যে নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা অনিষ্টবিরতি অহিংসার অর্থ নয়। অহিংসা ক্রিয়াশীল—প্রীতিমূলক করুণা।

অশোকের অবদান সিংহলকে ভারতবর্ষের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধেছে। অবন্তীদেশে সাঁচির সন্নিকটে মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘমিত্রা জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। এঁরাই রাজ-আজ্ঞায় লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গিয়েছিলেন। বোধিবৃক্ষের শাখা পৌঁছে দিয়েছিলেন তাম্রপর্ণী অনুরাধপুরে। নবীন বৌদ্ধদেশ মেতে উঠেছিল প্রভু বুদ্ধের বাণীতে। তার আন্তরিকতার যশ সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষে মুখরিত হয়েছিল। বুদ্ধঘোষ পাটলিপুত্রে বলেছিলেন—তাম্বপন্নীদ্বীপো কির চেতিয় মালালংকগে ইত্যাদি। অর্থাৎ তাম্রপর্ণী দ্বীপ মালা অলংকৃত। সদা গৈরিক বস্ত্রাবৃতেরা পথে গমনাগমন করে। সেখানে লোকে যথা ইচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করতে পারে। এ দেশে উৎকৃষ্ট গৃহ এবং বন্ধু মেলে। শাস্ত্রালোচনা শোনা যায়।

প্রাচীন অহিংসাবাদী সাম্রাজ্যবাদ আর আধুনিক শোষণ লুব্ধ সাম্রাজ্যবাদের প্রচার ভঙ্গীর একটা দৃষ্টান্ত এই স্থলে দিব।

ডাঃ পীয়েরী বলেন—তুহাজার বৎসরের বৌদ্ধধর্ম সিংহলী জাতিকে মাদকদ্রব্য পানের দোষ হ'তে সর্বতোভাবে মুক্ত করেছে।

উদারচিত্ত সুপণ্ডিত রিস্ ডেভিস্ বলেন—সাধারণ ব্রিটিস্ কৃষক অপেক্ষা অতি দীন সিংহলী প্রজাও সচ্চরিত্র। লঙ্কাদ্বীপে খৃষ্টীয়ধর্ম প্রবর্ত্তনের পূর্বে গণিকাবৃত্তি অজ্ঞাত ছিল।

আমি তুজন বিশিষ্ট সমকালের বিদ্বানের মত উদ্ধৃত করলাম বিলাতী অপর এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের জঘন্য অপচেষ্টা প্রমাণের জন্য। বিশপ হেবার খৃষ্টীয় ধর্মযাজক। তাঁর রচিত নিম্নলিখিত গানটি ইংরাজিতে সুললিত ছন্দে মধুর সুরে সর্বদা সিলোনের খৃষ্টীয় গির্জায় শোনা যায়। প্রভু যীশুও দয়ার অবতার। তাঁর উপদেশ জগতকে বর্বরতা হতে উচ্চে তুলছে। কিন্তু তাঁর সেবক পুরোহিতের রচিত জঘন্য গান তাঁর উপাসনা মন্দিরে গীত হ'লে পবিত্রতা দারুণ আহত হয়।

যদিও বহে গন্ধবাহী বায়ু হিল্লোল
মৃতু ভাবে সিলোনের দ্বীপের পরে।
সেথা প্রত্যেক দৃশ্য প্রীতিকর
মাত্র মানুষগুলি নিকৃষ্ট।
বৃথাই দয়ার দ্বার মুক্ত করে
ঈশ্বরের বিস্তৃত দান।
হিদেন তার অন্ধতার ফলে
কাঠ ও পাথরের কাছে মাথা নত করে।

সাধারণতঃ ইতিহাস প্রবলের জীবন বৃত্তান্ত। এখন তার ধারা বদলেছে। পৃথিবীর সকল দেশের পুরাতন ইতিহাসই বহু রাজার দিগ্বিজয়ের দামামা দুন্দুভির জয়বাদ্য শুনিয়েছে উত্তর যুগের মানুষকে। কিন্তু সে কাহিনী অন্তরের শ্রদ্ধার কোটরে সাড়া পায় না। দেশ রক্ষার বীরত্ব, দুঃশাসন নিরোধ বা অত্যাচার দমনের কথায় আনন্দ হয়। কিন্তু সংযম এবং তিতিক্ষার কথা যেমন আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তেমন কোনো বীরত্বের কাহিনী করে না। ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্য্যয়, এসব এদেশের আদর্শ। সেই জন্যে অশোক আমাদের চির প্রণম্য।

কেবল আমরা কেন, কোনো পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকার অশোকের প্রাপ্য সম্মান নিবেদন করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সেনার্ট বুদ্ধরই অস্তিত্বে সন্দিহান। গৌতম কাল্পনিক ব্যক্তি। সূর্য্য-দেবতার পূজা একটু রং বদ্‌লে বুদ্ধ পূজায় পরিণত হয়েছিল। ধর্ম্মচক্র সূর্য্যের তেজের ছটা ইত্যাদি ইত্যাদি কথা যে অতি পণ্ডিত অযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করতে বহু বাক্য ব্যয় করেছেন তাঁকেও দয়া ক'রে অশোককে জনহিতকর, বিশ্ব বন্ধু ভূপতি ব'লে স্বীকার করতে হয়েছে। অন্যে পরে কা কথা?

ইংরাজ ইতিবৃত্তকার ওয়েলস স্পষ্টবাদী। আধুনিক সাম্যবাদী মনোভাব প্রকট তাঁর ইতিবৃত্তে। অশোক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিড় ক'রে বসে আছে লক্ষ

লক্ষ ভূপতি। কেহ ম্যাজেষ্টি, কেহ গ্রেসাসনেস, কেহ সিরিনিটি, কেহ রয়েল হাইনেস প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত। তাদের মধ্যে কেবল অশোকেরই নাম জ্যোতির্ময়, তারকার মত জ্যোতির্ময়। ভলগা হ'তে জাপান অবধি তাঁর নাম সম্মানিত। চীন, তিব্বত, এমন কি যে ভারতবর্ষ তাঁর ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে, সে ভারতবর্ষও, তাঁর মহত্বের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে। যত লোক কনস্ট্যানটাইন বা সারলিমেনের নাম শুনেছে, তাদের অপেক্ষা অধিক লোক আজ অশোকের স্মৃতি পালন করে।

শিবাজি রাজর্ষি হয়েছিলেন, অশোক প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ বিশ্ব-হিতৈষী লোকপালদের ঐতিহ্যে চিত্তে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে। রাজর্ষি শব্দের প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় আছে কিনা জানিনা—কিন্তু ভারতের ইতিহাসে জনক হ'তে আরম্ভ ক'রে বহু রাজর্ষির কথা শোনা যায়। ভারতবর্ষের আবহাওয়া ত্যাগী রাজন্যবর্গ পোষণ করত। তাঁদের কার্যে ভারতেরও গৌরবময় মূর্ত্তি দেখেছিলেন কবিগুরু। তাই সগর্বে তিনি বলেছিলেন—

'হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্য দৈন্য করিতে উজ্জ্বল।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান মন্ত্রী, সাহিত্যিক, ইতিবৃত্তকার,

উদার জনসেবক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৩২ সালে স্নেহের কন্যাকে লিখেছিলেন—

আমার ভয় হয় যে নরপতি এবং রাজকুমারদের খর্ব করতে আমি একটু বেশী ভাল বাসি। আমি তাদের শ্রেণীতে প্রশংসা করবার বা শ্রদ্ধা নিবেদন করবার মত অতি অল্প কিছুই দেখি। কিন্তু আমরা এখন এমন এক মানুষের প্রসঙ্গে এসে পড়েছি, যিনি ভূপতি এবং সম্রাট হওয়া সত্বেও, মহৎ ছিলেন এবং প্রশংসার যোগ্য। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্র-পৌত্র অশোক।

ওয়েল্‌সের উক্ত মত উদ্ধৃত ক'রে পণ্ডিতজী বলেছেন—বাস্তবিক এ অতি উচ্চ প্রশংসা। কিন্তু এ তাঁর লভ্য। এবং একজন ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষের ঐ যুগের ইতিহাসের চিন্তায় বিশেষ আনন্দ আছে।

চারু-কলা

সাঁচির শিল্প পরিচয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের চারু-কলা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। রূপ-তৃষা মানুষের সহজ বৃত্তি। শিশু চেতনার উদ্বোধনের সাথী মনোরম বর্ণ-প্রিয়তা। মানুষ সৌন্দর্যে আমোদ পায়, তাই সুন্দরের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়। কারণ প্রকৃতি লীলা-চঞ্চল। আদিম মানুষের আঁকা বহু চিত্র আমাদের দৃষ্টিপথে পড়েছে। সমাজ যখন সংহত ও উন্নত হয়, ধীরে ধীরে সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়। চারু-কলারও সেই সঙ্গে পরিণতি। বিজয়ী সঙ্ঘপতি বা নরপতি নর-শোণিতের স্রোত বহিয়ে, শেষে শিল্পে তুষ্টিলাভ করত; বিজিত বন্দীদের শ্রমে রাজপথ, কীর্ত্তি-স্তম্ভ, বিজয়-তোরণ, সৌধ বা মন্দির নির্মাণ কর্ত্ত। আজিও সকল ধনী সম্পদের সহগামী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে।

জগত-স্রষ্টার ধারণাও সকল দেশে, অতি আধুনিক ব্যতীত সকল যুগে, মানব-চেতনাকে সংহত, সংযত এবং উন্নত করেছে। উপার্জিত ঐশ্বর্য্য এবং চিত্তের আনুগত্য মিলিয়ে, মানুষ জগদীশ্বরের পূজার আয়োজনের প্রয়োজন বোধ করছে চিরদিন। তাই সকল প্রাচীন দেশের শ্রেষ্ঠ সৌধ ভগবানের মহিমা স্মরণের ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগ ঈশ্বরের মহিমা ধ্যান ক'রে মূর্ত্তি পরিকল্পনা কর্ত্ত। সে মূর্ত্তিগুলি কলাবিস্তারের সহায়ক।

বলেছি পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সঙ্কলনের বহু মাল-মসলা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষ বা এসিয়ার অন্য কোনো দেশের অন্তরের সন্ধান লাভ করতে পারেন নি। ভারতের শিল্প, সাহিত্য বা সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের যুগ ভাগ প্রকৃত ভিত্তিহীন। সকল দেশেই বর্ত্তমান দিন অতীতের পরিণতি এবং ভাবী-কালের বীজ-ক্ষেত্র। বিভাগ মাত্র ইংরাজ ও ভারতীয়ের সংস্পর্শের দিনে দুই জাতির মধ্যে হয়েছিল। যেহেতু ইংরাজের পক্ষে এ দেশ হ'য়েছিল কর্মক্ষেত্র। শাসন ও শোষণ ক'রে সে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ত্ত—ইংরাজ বণিক বা রাজপুরুষ ভারতবাসীর ভাব ভাষা রুচি বা মনোবৃত্তির ছন্দে নিজের জীবনছন্দকে মেলাবার কোনোকালে চেষ্টা করেনি।

হিন্দু-যুগ বা বৌদ্ধ-যুগ কোনো নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী দেওয়া যুগ ছিলনা। গৌতমের আবির্ভাবের পর ভারতবর্ষের জীবন-স্রোত ধীরে ধীরে কথঞ্চিত পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। মতামত, অভিরুচি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে মেলামেশা সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ হ'তে আরম্ভ করে সকল মহাপুরুষ, মহামানব, জন-নায়ক ভারতবাসীর জীবনকে সুষ্ঠু ও ভাব-সম্পদে সম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে কতকদিকে বর্জন, কতক বিষয়ে পরিবর্ত্তন এবং কতকদিকে উন্মেষণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পুরাতন জীবন মহীরূহের মূলোচ্ছেদ ক'রে জীবন-ক্ষেত্রে কেহ নূতন বীজ বপন করেননি। এমন

কি মোগলযুগ পাঠানযুগও খেয়ালী নামকরণ। কারণ রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে, ভেদি মরুপথ গিরিপর্ব্বত যারা এসেছিল সবে, তারাও ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিল। কর্ম্মান্তে, জীবন-সন্ধ্যায় তারা তুর্কী, আফগানিস্তান বা ইরাণে পালিয়ে যেতোনা, ভারতবর্ষে উপার্জিত ঐশ্বর্য্যে বিলাসলীলার অভিলাষে। রাজ্যের শাসক ভারতবাসী মুসলমান ভূপতি ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শাসনভার ছিল হিন্দু এবং মুসলমান রাজকর্ম্মচারী উভয়ের হস্তে।

এ কথা সত্য যে মাত্র ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্পদ এবং ভাবধারা প্রভু বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বন্যায় প্রভূত পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। শিল্পজগতে সে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছিল গৌতমের আবির্ভাবের প্রায় তিনশত বৎসর পরে। তথাগত স্বয়ং বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন। তাঁর মৈত্রী, করুণা এবং অহিংসার উপদেশ ত্যাগের চরম পন্থা অবলম্বন করবার সহায়ক। বৌদ্ধ নীতির নির্দেশ, জীবনের চলার পথের প্রতি পাদক্ষেপ নির্বাণের পথে যাত্রা ভাবতে হবে। বাসনা-বিরতি চরম ত্যাগের সহায়ক। ভোগ কেবল তৃষ্ণা বাড়ায়।

প্রথমে বৌদ্ধের পক্ষে তণহা বাড়াবার ভয়ে সঙ্ঘ বিহারের প্রাচীর গাত্রে নরনারীর মূর্ত্তি চিত্রণ বা উৎকীরণ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ-বিধি হ'তে সিদ্ধান্ত করা যায় সেকালের শিল্পের গতি। ইন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্য বিলাস, পার্থিব ভোগ ও

আসক্তির ফাঁদ। দশধম্মসুত্ত তাই বলেছে—সৌন্দর্য্য আমার পক্ষে অকিঞ্চিতকর দেহেরই হক বা বেশ-ভূষা প্রসাধনেরই হ'ক।

লতা পাতা বা ফুলের মালা উৎকীরণ কিন্তু নিষিদ্ধ হয়নি। নিশ্চয়ই সেকালে মন্দির বা মঠের প্রাচীরের শিল্প শোভার সমাদর ছিল। সেই শোভা ছিল মনোলোভা। তার মোহ কাটাবার প্রয়াসই বিধি-নিষেধের উদ্ভাবক। এমন কি শিল্পীর বৃত্তি হতে বিরত করবার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ মাগ্‌গ চিত্রকর, গায়ক, গন্ধানুলেপনির্মাতা, পাচক, অরিষ্ট প্রস্তুতকারী চিকিৎসককে, যারা ইন্দ্রিয়-বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করে, তাদের সঙ্গে এক শ্রেণী ভুক্ত করেছে। লোকে এদের সম্মান করে বটে। বিশুদ্ধ মাগ্‌গের মতে, ইন্দ্রিয় ভোগের সামগ্রী জনপ্রিয়, তাই তাদের সমাদর। কিন্তু তারা সিদ্ধির পথ দুর্গম করে। সে কালের জৈন তীর্থঙ্করদেরও শিক্ষা ছিল ঐ নীতির অনুরূপ। বেদান্তবিদ্‌ মায়াবাদী সন্ন্যাসীও শিল্প বিলাসের বিরোধী।

দার্শনিক মতবাদ সাধারণের প্রবৃত্তি মার্গকে অবরোধ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভক্তি পথের সন্ধান দিয়ে মানুষের সহজ সংস্কারকে নীতি পথে অনুশাসিত করেছে। সে অনুশাসনে পরলোকের কঠোরতার চিত্র যথেষ্ট আছে। আতঙ্ক রস শুকিয়ে দেয়। প্রেম রসোপলব্ধিকে গাঢ় করে। শিল্পের প্রসার রস-চেতনা উদ্বোধনের প্রধান সহায়ক। মহেঞ্জোদারোর শিল্প হতে ভারতের সকল দিনের শিল্প সাধনা

নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ ঘিরে। সুন্দরের অনুভূতি সত্য। ভক্তি-মার্গ সত্য-সুন্দরকে প্রকাশ করবার জন্য চারুশিল্পের আশ্রয় নেয়। মার্কিনের অতি আধুনিক গগন-চুম্বী সৌধ বাদ দিলে, প্রত্যেক দেশের প্রতিযুগের শ্রেষ্ঠ অট্টালিকার সৃষ্টি ও পরিকল্পনা ভুবনস্রষ্টা অতি-সুন্দরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে নির্মিত। গন্ধ পুষ্প, মিষ্টফল প্রভৃতি উৎপাদনের আয়াসের মূলে প্রেম ও ভক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বলছিলাম সাধারণ সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা এবং দার্শনিক মতবাদ প্রসূত বৈরাগ্যর অসামঞ্জস্যতার কথা। উপনিষদের আত্মজ্ঞান বা বুদ্ধদেবের চরম শিক্ষা—মানুষের ধ্যানে, সংযমে, চরিত্রে, কর্ম্মে নির্ব্বাণ লাভের ব্যবস্থা, আপামর সাধারণের ভক্তিপ্রবণ প্রাণকে তুষ্ট করতে পারলে না। পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি-গ্রাহ্য শুদ্ধ বৌদ্ধ-নীতি-সুধা প্রাচ্যের কোনো জনসঙ্ঘকে নিছক নিষ্কাম আত্ম-চর্চ্চার পথে এগিয়ে দিলে না। গৌতমের সম্বোধি লাভের চিত্তাকর্ষক মর্মকথা, তাঁর ত্যাগ এবং জীবে দয়ার বাণী মানুষের অন্তস্তলে শিহরণ উপলব্ধি করায়। যিনি করুণাঘন, যিনি বিশ্বসংসারের মিত্র, যাঁর অগাধ প্রেমের ফল্গু ত্রিভূবন ঘিরে, তাঁর প্রতি ভক্তি আপনি উদ্বুদ্ধ হয় মানব-মনের শুদ্ধ চেতনায়। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি-মন্দিরে ঐকান্তিক ভক্তির অজস্র স্রোত বর্ষিত হ'ল। সে প্লাবনের পথ রোধ করতে পারলে না দার্শনিক বিরাগ-বাদ। অনুরাগ মাত্র ভারতবর্ষে নয়, সিংহল, ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম, তিব্বত, মাঞ্চুরিয়া

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। প্রত্যেক দেশের প্রচলিত শিল্প সাধনার বেগ নতুন খাদে প্রবাহিত হ'ল গৌতমের স্মৃতি ঘিরে।

ভারতবর্ষের তিন শত বৎসরের বাঁধ ভেঙ্গে গেল মহামতি ভক্ত-প্রধান অশোকের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায়। যে সব ভারতীয় শিল্পী অন্য পথে চলছিল, তাদের প্রাণে জেগে উঠলো ধ্যান-গম্ভীর ত্যাগী সম্বুদ্ধের দীপ্ত মূর্ত্তি। তাঁর নির্বাণের অপূর্ব সমাচারে যতটুকু সত্যের সন্ধান উপলব্ধি করলে সাধারণ গৃহস্থ, তাতে তার চেতনায় ফুটে উঠলো ভক্তি-প্রসূন। সে আনুগত্য বাহিরে প্রকাশ পেলে শিল্প সাধনায়। বিহার, চৈত্য, গুম্ফা, দাগোবা এবং স্তুপ ক্রমশঃ নির্ম্মম কঠোরতা বর্জন করলে। ভারতবর্ষে প্রচলিত শিল্পের বিশেষ বিকাশ পরিলক্ষিত হ'ল বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানে। অশোক যুগের শিল্পে কোথাও বাহিরের প্রভাবের ইঙ্গিত আছে। উন্নতি মার্গের সেটা সহজ রীতি। নব নব ভাব নতুন নতুন রূপকে বিকশিত করে, অনাদৃত, অবজ্ঞাত ভাবকে নুতন ভূষণে সাজিয়ে ব্যক্ত করে। মানব প্রাণের উদ্বোধনের নিয়মই তাই। যদি গ্রীক যবনের সংস্পর্শে এসে ভারতবাসী তার চিরাচরিত সৌন্দর্য-রস মার্গকে পরিবর্দ্ধিত ক'রে থাকে, সে সংবাদে একদিকে যেমন লজ্জার কারণ নাই, অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষকে গ্রীক হ'তে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করবার অপচেষ্টারও সার্থকতা নাই।

অশোক-যুগে ভারতের শিল্প কলা এবং ভাব-স্রোত শৈল এবং জলধির গণ্ডী উপচিয়ে বাহিরে প্লাবিত হয়েছিল।

সিংহল দ্বীপের শিল্প ও কৃষ্টি বিশেষ রূপে মহাদেশের ছন্দের তালে বাঁধা পড়লো। অশোক-কালের পূর্বের দিনের মূর্ত্তি, চিত্র, ভাস্কর্য্য বা তক্ষণ শিল্পের নিদর্শন আজ বিগ্যমান নাই। অশোক-যুগের শিল্প পরিচয়ও পূর্ণ-রূপে পাওয়া যায় না। কারণ কালের নিষ্ঠুর সংহার-অভিযান প্রস্তর শিলাও বহুদিন প্রতিরোধ করতে পারে না। তবু ও বহু যক্ষ, রক্ষ, নাগ নাগিনীর উৎকীর্ণ মূর্ত্তির অবশেষ অজিও বিগ্যমান। প্রাচীন হিন্দুশিল্পের এই মনোরম বিকাশ বৌদ্ধ শিল্পও বর্জন করতে পারেনি। কাজেই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রাচীরের গায়ে দেখি নাগ-নাগিনী, যক্ষ-রক্ষের চিত্র। চীন তার ড্রেগনকে কোনোদিন শিল্প সংসারের গণ্ডীর বাহিরে রাখতে সমর্থ হয়নি। লঙ্কায় নাগ-নাগিনী এবং অপ্সরীর চিত্র বহুল পরিমাণে বিগ্যমান। কেলানীয়া মন্দির অধুনা সংস্কৃত হয়েছে। তার প্রাচীর গাত্রে নতুন মূর্ত্তি উৎকীর্ণ পাথর বসানো হয়েছে। নবীন শিল্পও যক্ষ ও নাগমূর্ত্তি বর্জন করতে পারেনি। শ্রীরামচন্দ্র একটি চিত্রে বিভীষণের রাজ্যাভিষেকে ব্যাপৃত।

গান্ধারে যবন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় শিল্পে। ধ্যানী গৌতমের সমস্তভোলা, মাত্র অন্তর-চাওয়া আকৃতির বিশেষ অভাব ও দেশের সুন্দর মূর্ত্তি গুলিতে। সুন্দর কারণ সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য, সংহতি এবং ভারসাম্য সে দৃষ্টিআরাম মূর্ত্তিগুলিতে বিগ্যমান। সিদ্ধার্থের পরিপাটি বেশ ভূষা এমন কি বস্ত্রের ভাঁজগুলি অবধি অনবগ্য ভাবে চিত্রিত। কিন্তু যবন-শিল্পী

পদ্মাসনে উপবিষ্টের নিগুঢ় যোগের সন্ধান বুঝে উঠতে পারে নি। পদ্ম হৃদিপদ্মের নিদর্শন। সম্বোধি ফুটে ওঠে হৃদয়ে একান্ত চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধে। কমলাসনস্থ যোগেশ্বর বুদ্ধের সেটা বসবার আসন নয়। আমার মনে হয় সম্বুদ্ধ গৌতমের শিল্প পরিকল্পনায় হৃদিপদ্ম হ'তে বিকসিত বুদ্ধভগবান।

সাঁচির যক্ষ-মূর্ত্তি বোধ হয় দ্বিতীয় শতকের। অমরাবতীর প্রণতা পূজারিনীদের চিত্র চমৎকার। হয়তো তাতে সামান্য বিদেশী প্রভাব আছে। কিন্তু দেহের গতি ও পরিণতি ভারতীয় কলার বিকাশ। তাদের সকল মাধুরীর পরিণতি প্রণামের ভঙ্গিতে। ভরহুতে যক্ষ, দ্বারপাল প্রভৃতি প্রচুর। বিশ্বকর্মার মূর্ত্তি এবং দ্বারপালদের অত্যাবশ্যক অঙ্কন ভারতবর্ষ এবং সিংহল অতিক্রম ক'রে, ব্রহ্ম, মলয় চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে পৌঁছেছিল। বোধ হয় চীনে পৌঁছেছিল তিব্বতের পথে, ব্রহ্মে পৌঁছেছিল বাঙালী নাবিকের নৌকায়।

সাঞ্চী, অমরাবতী প্রভৃতির যক্ষিণী নারীর চিত্র লীলা-মধুর। এই শ্রেণীর উৎকীর্ণ মূর্ত্তি এক দিকে যেমন বুদ্ধদেবের গরিমা গৌরব প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি পালি সূত্রের নির্দেশ বিরোধী। কুমারস্বামী বলেন, পালিসূত্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে মৃত্যুর পরও দেহ যেমন অপ্রীতিকর, প্রাণবন্ত দেহও তেমনি জঘন্য। অথচ সেই সূত্ত হতে কী বিভিন্ন জগতেই না বিচরণ করে এই আনন্দময়ী যক্ষ নারীরা।

পরিণত হিন্দু-শিল্প অন্তরের সৌন্দর্য্যের নিকট পার্থিব

সৌন্দর্য্য, দেহের লাবণ্যের পরাজয়ের বাণী ঘোষণা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাই দেখি সকল মন্দিরের বাহিরে যক্ষ, নাগ, নাগিনী প্রভৃতি সুন্দর রূপ-পরিকল্পনার বিকাশ। কিন্তু তারা বাহ্য প্রকৃতি। বাহিরের তরঙ্গ। তাদের উপর ভাসলে চলবে না। গৌতমকে প্রলোভিত করেছিল মহামার। তিনি মহামারমার। তাঁর পুণ্য দর্শন লাভ করতে গেলে নর্ত্তকী ও গায়িকার মোহ মুক্ত হতে হবে। তাই মন্দিরের বাহিরে বোধ হয় তাদের স্থান, ভক্তের পরীক্ষার জন্য।

ভারতবর্ষে শিল্প কলার সম্প্রসারণের সঙ্গে আখ্যানবস্তুও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সাঁচির প্রাচীন স্তুপের শিল্পের সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগে নির্মিত স্তুপের শিল্পের তুলনায় একথা স্পষ্ট মনে হয়। বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, স্তুপ ও স্তম্ভে যে নানা শিল্প পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি খৃষ্টপূর্ব ছয়শত বৎসরের ও খৃষ্টের পর তিন শতকের কারুকার্য্য।

দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দিরের গায়ে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যায়িকার উৎকীর্ণ চিত্র দেখা যায়। তেমনি সাঁচির বেষ্টনী গাত্রে, ভরহুতের পাথরের বেড়ায় জাতকের গল্পের চিত্র। সারনাথে যে কয়েকখানি প্রস্তর পাওয়া গেছে তাতে সিদ্ধার্থের জন্মের চিত্র বড় হৃদয়গ্রাহী। সিংহলে সঙ্ঘমিত্তর বোধিদ্রুম দান এক অপূর্ব ঘটনা। ঐতিহাসিক কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ওদেশের বহু চিত্র।

স্থাপত্য

বৌদ্ধ ভূপতিদিগের আগ্রহে ভারতবর্ষে যে স্থাপত্য-বিদ্যার প্রসার হয়েছিল, ডাঃ ফারগুসন সেগুলিকে পাঁচভাগে বিভাগ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে ঐশ্রেণীর শিল্প নিছক ভারতীয় কলা। এর মধ্যে যোন বা মিশরীয় কলার যোজনা বা সংমিশ্রণ নাই। পাঁচ শ্রেণীর রচনা—

(১) লাট বা পাথরের থাম এবং তার গায়ে খোদাই করা লিপি।

(২) স্তূপ।

(৩) বেষ্টনী বা বেড়া।

(৪) চৈত্য।

(৫) বিহার বা শ্রমণ, থের প্রভৃতিদের বাসের আশ্রম।

লাট প্রথম নির্মাণ করেন রাজ-চক্রবর্তী অশোক। সাঁচিতে তার একটি নিদর্শন আছে। দিল্লির লাটের উপর সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের রাজ্যাভিষেকের কাল ফারসীতে কুঁদে দিয়েছিলেন। প্রয়াগের লাট ও প্রসিদ্ধ কুতবমিনারের নিকটস্থ লাট ইস্পাতের। কোনো আধুনিক কর্মী মরচে ধরেনা এমন সুন্দর লোহার স্তম্ভ নির্মাণ করতে পারে না।

অশোক ৮৪০০০ স্তূপ রচনা করেছিলেন। ঐ সব স্তূপের মধ্যে ভিলসা তোপই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আধুনিক যুগে

অতি অল্প সংখ্যক তুপ বর্ত্তমান। সাঁচির বড় স্তুপটির ১৪ ফুট উঁচু চাতাল। এর ব্যাস ১০৬ ফুট। চারিদিকের দৃষ্টি-সুখকর বেড়াগুলি নিশ্চয় কোনো কাঠের বেড়ার অনুকরণে বালি-পাথরে তৈয়ারী। স্তুপ ৪২ ফুট উঁচু, শিরোভাগের ব্যাস ৫॥০ ফুট, পরিবেষ্টনী এগারো ফুট উচ্চ। সুন্দর তোরণগুলি ৩৩ ফুট উঁচু। স্তুপটি ইঁটের তৈরী উপরে পাথর দিয়ে ঢাকা।

সমস্ত সাঁচি এলাকার মধ্যে, পূর্বোক্ত পাঁচ জায়গায় অন্ততঃ ষাটটি স্তুপ আছে। এদের মধ্যে কোনগুলি কোন আমলের তা বলা যায় না। খৃঃপূ তৃতীয় শতক হতে খৃষ্টের পর ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সবগুলি তৈরী।

বেষ্টনীর চরম সৌন্দর্য্য বরহুত এবং সাঁচির স্তুপের প্রাকারে। বরহুত এলাহাবাদ এবং জব্বলপুরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। বুদ্ধ গয়াতেও রেল আছে। স্তুপ-ঘেরা পাথরের বেড়ার পরিকল্পনায় পল্লীবাসীর সরল গ্রাম্য গৃহস্থালীর ভাবকে ফোটায়। তার গায়ে খোদা বুদ্ধদেবের জাতক-কাহিনী, সুন্দর পুষ্প বা পরিচিত হস্তী, হরিণ, গাভী প্রভৃতি জন্মজন্মান্তরের অখণ্ড একতার আভাস সূচনা করে।

সম্ভবতঃ পিয়দশীর সময় সাঁচিতে যে স্তুপ নির্মিত হয়েছিল, তার ঐ প্রকার প্রাকার ছিল না, পরে এক এক ধনী বা রাজা সেগুলি নির্মাণ করেছিলেন। বুদ্ধ গয়ার প্রাচীর নাকি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এর নির্মাণ কাল খৃঃপূঃ ২৫০ সাল বলিয়া নির্ণীত হয়েছে। তার পর বরহুত রেল ২০০ খৃঃপূঃ।

সাঞ্চীর বৃহৎ স্তুপ ঘেরা বেড়াটি গোল। এর ব্যাস ১৪০ ফুট, দু ফুট অন্তর অন্তর আট পল খুঁটি। অষ্টভূজ হয়তো অটঠো মাগ্‌গ স্মরণের ব্যবস্থা। তুপ অশোকের কালের কিন্তু বেষ্টনীর বিভিন্ন উৎকীর্ণ নাম হতে বোঝা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নকালে সেগুলি সংযোগ করেছেন।

সাঁচির বৃহৎ স্তুপের চারটি তোরণ ছিল অতিশয় সুদৃশ্য। তোরণ বৌদ্ধ জগতে এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে এমনকি জাপানী ভাষায় তোরী শব্দ তোরণ দ্বার রূপে ব্যবহার হয়। প্রাচীন নারার তোরী জাপানী কৃষ্টি অনুগত সরল বটে কিন্তু সেরূপ তোরীগুলি যে সাঁচি, বরহুত প্রভৃতি তোরণের অনুকরণ দ্বারা ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সে কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে। সাঁচির তোরণের খুঁটি, উপরের তিন থাক এড়ো পাথর, সামনে পিছনে বহু চিত্র সমন্বিত। থামের সঙ্গে শিরের এড়ো পাথরের সংযোগস্থলে অনবদ্য হস্তী মূর্ত্তি। ধারে যক্ষ-নারী। শিরোভূষণ ধর্মচক্র উপরে ত্রি-পিটক। প্রত্যেক অংশে চিত্র। ধারে বৃত্ত।

ডাঃ ফার্গুসন এই তোরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সার জন মার্শালের বর্ণনা, ডাঃ কানিংহাম, রিসডেভিজ প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা বড় চিত্তগ্রাহী। প্রাচীন দিনের চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্, ফা হিয়ান প্রভৃতি বিস্মিত হয়েছিল এদের কারুকার্যে। আজিও রসজ্ঞের চিত্তে প্রীতি সম্পাদন করে সাঁচির ভাস্কর্য্য ও শিল্পকলা আর দুঃখ দেয় তাদের শোচনীয় অবহেলা।

পূর্বদিকের তোরণ সম্বন্ধে পণ্ডিত রিস্ ডেভিসের অনুমান যে সিংহলে ধর্ম প্রচারের কাহিনী তাতে বিবৃত। সে অনুমান সত্য। কারণ দেখা যায় একটি বামন এক নরপতিকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামতে সাহায্য করছে। একটি পাত্রে মহাসমারোহে বোধি-দ্রুমের শাখা প্রদান করা হ'চ্চে অপর নরপতিকে। সমারোহ, বাদ্যকার, প্রণতানারী প্রভৃতির বহু চিত্র। তার সঙ্গে একটি ময়ূরের চিত্র—মৌর্য্য বংশের প্রতীক এবং একটি সিংহচিত্র—সিংহলের জাতীয় চিহ্ন।

এই কলাপী-কেশরী চিহ্নিত তোরণের সৌন্দর্য্য মনোরম। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ভূপতি তৃতীয় নেপোলিয়ন ভূপালের নবাবের নিকট এটি উপহার চান। অবশ্য নবাব দেশের এই প্রাচীন সম্পদ হস্তান্তর করেন নি। প্যারিসে এর একটি ছাঁচ পাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সাঁচি বৌদ্ধদের চৈত্যগিরি। বহু স্মৃতি বিজড়িত, অবহেলায় নষ্ট-প্রায় স্মৃতি-চিহ্ন। মহেন্দ্রর স্মৃতি জড়ানো সাঁচির সাথে। তিনি এই চৈত্যগিরি হতে লঙ্কার চৈত্যগিরি মিহিনতালে শুভাযাত্রা করেছিলেন। সঙ্ঘমিত্রার পুণ্য-স্মৃতি জড়ানো এই ভিলসা প্রদেশের সঙ্গে। অবন্তী, উজ্জয়িনী, ভিলসা, সাঁচি— এসব শব্দে ভারতবাসী মাত্রের প্রাণ সগর্ব্বে স্পন্দিত হয়, মহিমময় অতীতের স্মৃতিতে। প্রাণে কর্ম-প্রেরণা জেগে ওঠে, ভবিষ্যতের চিত্র মধুর হয়। জগতে ভারতবর্ষ বিস্তৃত হয়েছিল অশোকের উদারনীতির ফলে।

ভস্মাবশেষ-আবিষ্কার

সাঁচির তৃতীয় স্তূপে জেনেরাল কানিংহাম সারিপুত্ত এবং মহামোগ্‌গল্লানের বরবপুর ভস্মাবশেষ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সমন্বিত ছুটি আধার পেয়েছিলেন। এই আবিষ্কারে নিশ্চয়ই তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়েছিল। তাঁকে সবিশেষ যত্ন করতে হয়েছিল প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরাতন সমাধি-স্মৃতিকোষ উদ্ধার করতে। স্তূপটি ধ্বংশর চিহ্ন বুকে ধ'রে এককোণে পাহাড়ের একটি স্তরে অবজ্ঞাত ম্লানদেহে অবস্থান করছিল। স্তূপটিকে পুরাতন এক পাথরের প্রাচীর বেষ্টন করে রেখেছিল। তোরণের জীর্ণ অবস্থা।

১৮৫১ সালে জেনেরাল কানিংহামের মন আকৃষ্ট করলে তৃতীয় স্তূপ। তিনি উপর হতে তার মাঝে শলাকা চালালেন। নিচে চাতালের সমান ক্ষেত্রে স্তূপের অন্তরে অন্ধকারে প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা উত্তর দক্ষিণে রক্ষিত এক পাথরের সাড়া পাওয়া গেল। তার পর স্থির হল তার ছুদিকে ছুটি পাথরের সিন্দুক আছে। খনন কার্য্য আরম্ভ হল। অবশেষে সকল শ্রম সফল হল যখন আত্মপ্রকাশ করলে ছুটি পাথরের সিন্দুক। উপরে পাঁচ ফুট লম্বা পাথরে ঢাকা ছিল ছুটি প্রস্তরাধার। তাদের পাথরের ঢাকনির উপর প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদা নাম। দক্ষিণের সিন্ধুকের উপর লিখা ছিল—

সারিপুতস

উত্তরের বাক্সের ডালায় লেখা

মহামোগ্গল্লানস

অর্থাৎ সারিপুত্রস্য এবং মহামোগ্গল্লানস্য।

প্রত্যেক বাক্সটির লম্বা চওড়া এবং খাড়াইয়ের মাপ দেড় ফুট বা এক হাত। প্রত্যেক কিউব বা ঘন ডালা ৬ ইঞ্চি মোটা।

সারিপুত্ত নামাঙ্কিত সিন্দুকের ভিতর মাজা-ঘষা সাদা স্টিটাইট পাথরের একটি কোষ ৬ ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি উঁচু। এর উপরটি শক্ত এবং মসৃণ। এটি একখানি কালো মাটির থালায় ঢাকা ছিল—যার ব্যাস ৯ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি মোটা। থালাটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। উপরের বর্ণ মলিন কিন্তু তলার দিকটি বেশ চকচকে ছিল।

সেই আধারটির পার্শ্বে দু'টুকরা চন্দনকাঠ ছিল—৪½ ইঞ্চি, ২½ ইঞ্চি মাপের। কানিংহামের মতে এ দু টুকরা চন্দন কাঠ চিতা হতে সংগৃহীত হয়েছিল। কারণ চন্দন কাঠের চুল্লিতেই সারিপুত্রের বরতনু দাহ করা হয়েছিল।

বড় বাক্সর মধ্যে আধারের অবশ্য বাহিরে একটি জীবিত মাকড়সা পাওয়া গিয়েছিল!

অবশেষ কোষের অভ্যন্তরে পাওয়া গেল—মহাত্মা সারিপুত্রের একটুকরা অস্থি, এক ইঞ্চির কম, আর সাত রকমের সাতটি পাথরের টুকরা।

কানিংহাম সাহেবের মতে ঐরকম সাতটি রত্নের টুকরা সাধারণতঃ দেহাবশেষ স্মৃতির আধারে রাখবার বিধি ছিল।

সারি পুত্রের অস্থির সঙ্গে যে সপ্তরত্ন পাওয়া গিয়েছে তাদের একটি মুকুতা বড়্কী, দুটি ছোট মতি, চতুর্থটি বৈক্রান্ত মণি (গারনেট) একটি তারকার আকারের বৈদূর্য মণি (ল্যাপিসল্যাজুলি) ষষ্ঠটি স্ফটিক এবং সপ্তম প্রস্তরখণ্ড রাজাবর্ত মণি (এমেথিষ্ট)।

কানিংহাম বলেন—এই রীতি লাদাকের বৌদ্ধদের মধ্যে আজিও প্রচলিত। তারা সঙ্ঘপতির ভস্মের সঙ্গে অথবা লামার শবের সঙ্গে সোনা, রূপা, তামা এবং লোহার টুকরা কখনও মতি গারণেট ও ফিরোজা রাখে। গম, যব এবং ধানের কণা, শ্বেত ও রক্ত চন্দনের টুকরা এবং সুপকা বা চিড়গাছের শুকনো লম্বা ডাঁটি রাখে।

মহামোগ্গল্লানের ভস্মাধার যে পাথরের কোষে ছিল সেটি অপেক্ষাকৃত নরম। কারণ তার উপর সাদা পাথরের রেণু ছিল। আমার মনে হয় আজিও গয়ার যে সাদা পাথরের বাসন ও মূর্ত্তি পাওয়া যায় এটি সেই পাথরের। কারণ এঁদের জন্মস্থান ছিল রাজগৃহ নালকা। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ানের মতে নালন্দাই অতি প্রাচীন নালকা। কোষের মধ্যে মোগ্গল্লানের দুটি ছোট ছোট অস্থির টুক্রা পাওয়া গিয়াছে।

দুটি অবশেষ স্মৃতিকোষের ডালার ভিতরে কালি দিয়ে এক একটি অক্ষর লেখা। একটিতে—

স

অন্যটিতে

ম

এই দুটি হাতের লেখা অক্ষর অন্ততঃ ভারতে পাওয়া লিপির মধ্যে প্রাচীনমত। দুজনে বুদ্ধভগবানের দক্ষিণ ও বাম হস্ত ছিলেন তাই দুটি আধারের দুদিকে স্থিতি—ইহা আবিষ্কর্ত্তা কানিংহামের অভিমত।

এই দুটি কোষ ১৮৫০ সালে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা ছিল সংগ্রহ শালায় ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়মে।

অবশেষের পালি শব্দ পারিভোগিক। শারীরিক, পারিভোগিক এবং উদ্দেশিক তিন্ প্রকার চৈত্য নির্মিত হ'ত। চৈত্য যাহা চেতনা দেয়, স্মৃতি উদ্রেক করে। দার্জিলিং, খরসাং, ঘুম, কালিম্পঙ, শিকিম প্রভৃতি স্থানে বহু চৈত্য দেখেছি। সেগুলি লামাদের স্মরণার্থ নির্মিত। সিংহলে চৈত্য বা ছোট স্তুপকে সাধারণতঃ দাগোবা বলে।

হুয়েন সাঙ বাঙ্‌লার এক স্তুপের কথা বলেছেন। এর নাম জরাসন্ধর বৈঠক। আত্মভোলা বাংলা দেশ নিজের সোনা পরকে দিয়ে পরের গিল্‌টিকরা আভরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল প্রায় বিগত দুশো বৎসর। তাই এর কথা এদেশে অজ্ঞাত।

বোম্বাই প্রদেশে এবং পশ্চিম ভারতে ইলোরা, অজন্তা,

কার্লী প্রভৃতি গুহা বিচিত্র। এদের শিল্প এবং দেবদেবী ও অর্হত, বুদ্ধ, জিন প্রভৃতি মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দেখলে স্পষ্ট বোঝাযায়, ভারতবর্ষ একতা হারিয়ে স্বাধীনতা হারিয়েছিল কিন্তু উদারতা হারিয়ে অন্যান্য প্রাচীন দেশের মত ধর্মদ্বেষিতার নিষ্ঠুরতায় দুষ্ট হয়নি। ভারতবর্ষই সেই দেশ—

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার।
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধজগত ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর॥

সারিপুত্ত এবং মহামোগ্‌গল্লানের দেহাবশেষ ভগবান বুদ্ধ-স্পর্শ-পূত। তারা সংরক্ষিত হয়েছিল শ্রাবস্তির জেতকুঞ্জে। সেখান হতে সুদূর অবন্তী দেশে তারা পৌঁছিল কেমন করে?

সাবস্তী ও ভগবান বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ বক্ষে ধারণ করে রেখেছিল। মহামতি অশোক সেখানে গিয়ে সেই পবিত্র ভস্মরাশি বহু ভক্তকে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষণ করবার জন্য বিতরণ করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যরা নিশ্চয় অশোকের ভক্তি অর্ঘ্য লাভে বঞ্চিত হননি। তিনিই নিশ্চয় সেই দুজনার ভস্মাবশেষ অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপে স্বযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

আমার মনে হয় যে ঐ রেলিক্ আবার যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করবার যাঁরা ভার নিয়েছেন তাঁরা দেশের, দশের এবং ধর্মের যথার্থ সেবক। টুটনখামেনের সমাধি হ'তে যাঁরা যাদুঘরের জন্য মসলা সংগ্রহ করেছিলেন আমি তাঁদের সুখ্যাতি করি না। কেহ কেহ নাকি পাগল হয়ে গেছে। কত হৃদয়ের ব্যথা

প্রেম শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য জড়ানো থাকে সমাধির সঙ্গে সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ, জিন বা হিন্দু সাধু জীবিতকালে আততায়ীকে ক্ষমা করেন, তাঁরা স্বধাম হ'তে মানুষের প্রতি প্রেমই বর্ষণ করেন। অভিসম্পাতের ভাষা বা ভাব তাঁদের আত্মা অধিদিত। কিন্তু সভ্য মানুষের উচিত নয় জ্ঞান পিপাসায় কিম্বা কুতুহলী তৃষায় কোন পবিত্র স্মৃতি-মন্দির নিয়ে খেলা করা বা ইতিহাসের মসলা সংগ্রহ করা। মহেঞ্জোদারোর পাত্র বা মোহর সংগ্রহ এবং মহাত্মাদের অস্থি বা ভস্মসংগ্রহ বিভিন্ন ব্যাপার।

যা হক শেষ রক্ষাই রক্ষা।

চোরাশী হাজার স্তূপের একটি ৩০০ ফুট উচ্চ স্তুপ হুয়েঙ সাং (৭ম শতাব্দী) আফগানিস্থানে দেখেছিলেন। সিংহলের একটি ৪০০ ফুট উচ্চ স্তুপেরও কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

এ স্থলে একটা কথা বলি। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা ভারতবর্ষের দেবদেবী যক্ষ-যক্ষরমণী, মহাপুরুষ প্রভৃতির ভাস্কর মূর্ত্তিকে কিম্ভুতকিমাকার গ্রোটেস্ক প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন। ডাঃ ফার্গুসন বুদ্ধ-গয়া ও বরহুতের শিল্প সমালোচনা ক'রে বলেছেন কতকগুলি জন্তু, যেমন হাতী, হরিণ এবং বানর, এমন স্বাভাবিক ভাবে নির্মিত যার শিল্প শোভা জগতের কোনো দেশের শিল্পী অত সুন্দর ভাবে প্রকটিত করতে পারে নি। আমার নিবেদন যারা দশ-মুণ্ড রাবণ নির্মাণ করতে পারতো তাদের দ্বিভূজ মূর্ত্তি রচনার সামর্থ্য ছিল নিশ্চয়ই।

নর্তকী, বাদক, গায়িকা প্রভৃতির সচল গতি মনোরম। কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রের মাপে বিচিত্র। এর এক মাত্র কারণ ভারত মনকে ফোটাতে চেষ্টা করেছে। সাহিত্যে, শিল্পে, কাব্যে ও পুরাণে, পাশ্চাত্য দেহে ও দেহের সৌন্দর্য্যে অধিক আনন্দের সন্ধান দিয়েছে। সাঁচির উত্তর তোরণে এক ৪৫ ফুট যোগীমূর্ত্তি ছিল। আজিও মহীশূরের শ্রবণ বেলগোলায় অর্হত গোমত রায়ের বিশাল মূর্ত্তি বিরাজিত। এ-সব মূর্ত্তির মুখে শান্তিময় ধ্যান-গম্ভীর ভাব।

অন্যান্য স্তূপ

সাঁচির দ্বিতীয় স্তূপে কানিংহাম সাহেব এগার ইঞ্চি লম্বা সাড়ে নয় ইঞ্চি চওড়া একটি সিন্দুক পেয়েছেন। উপরে লেখা আছে—

সবিন বিনয়কান অরং কাশপ গোতম উপাদিয় অরং চ বাচা সুবিজয়তং বিনয়ক।

অর্থাৎ

সব বিনয়ক অর্হৎ কাশ্যপগোত্ত উপাধ্যায় প্রমুখ এবং অর্হৎ বাচা সৌবিজয়ত শিক্ষক।

এই আধারের মধ্যে উপাধ্যায় কাশপগোত্ত ব্যতীত অন্যান্য অর্হতদের অবশেষ স্মৃতি পাওয়া গিয়াছে। কাশ্যপ-গোত্তের কথা লেখা আছে—সপুরিস কাশ্যপগোতস সব হেমবতাচরিয়স। স্বধাম প্রাপ্ত অর্থাৎ দেহ-মুক্ত কাশপগোত্র হিমালয়ের আচার্য্য।

ঢাকনির ভিতরে লেখা

সপুরিস মঝিমস

অর্থাৎ মুক্ত মঝিম। এবং আধারের নিচে লেখা আছে।

সপুরিস হারিতীপুতস

মুক্ত হারিতীপুত্র

এক আধারে এই তিনজন মহাপুরুষের দেহাবশেষ ভস্ম
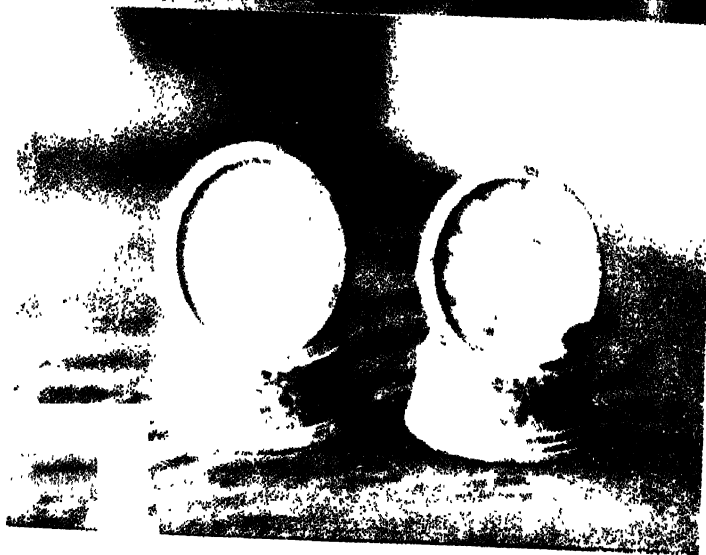
যে দুটি পাথরের কোষে ভস্মাবশেষ পাওয়া গিয়াছে
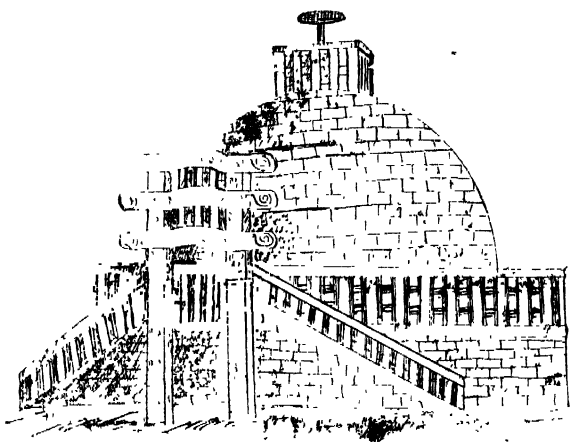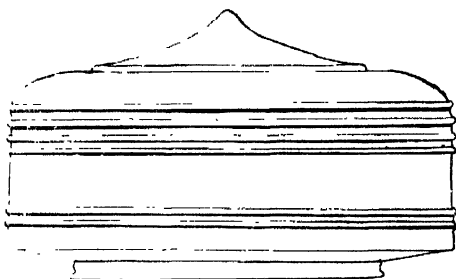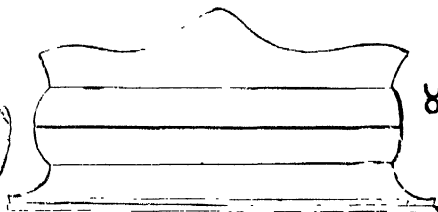
সাঁচি স্তূপ

(১) সংস্কার সাধনের পর স্তূপের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র
(২) যে আধারে সারিপুত্তের দেহাবশেষ রক্ষিত তাহার চিত্র
(৩) যে আধারে মোগ্‌গল্লানের দেহাবশেষ রক্ষিত তাহার চিত্র

আবিষ্কারের ফলে কানিংহাম সিংহলের ইতিহাস দ্বীপবংশ এবং মহাবংশে বর্ণিত ঘটনার সত্যের প্রমাণ পেয়েছেন। মহাবংশে বর্ণিত হয়েছে যে থের কাশপগোত্ত পুণ্যবান মঝম বা মধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে হিমাচল প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। জীবনে যাঁরা একই সূত্রের ডোরে বাঁধা পড়েছিলেন, মরণেও তাঁরা বিছিন্ন হননি।

দ্বিতীয় স্তূপে অপর একটি আধার পাওয়া গেছে মুক্ত মোগ্‌গলীপুত্তের ভস্মের। ইনি মহেন্দ্রর দীক্ষা গুরু অনুমিত হন।

সোনারির এক স্তূপে অন্যান্য নামের মধ্যে পাওয়া গেছে—গোতিপুত্ত হেমবত দুন্দুভিসর দাসাদাসেব। দুন্দুভিস্বরের নামও সিংহলের ইতিহাসে পাওয়া যায়। অন্যান্য নামও পাওয়া গেছে যা হতে কলম্বো বজিরারামের ভিক্ষু মেত্তেয় (মৈত্রেয়) তাঁর স্বদেশের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন। অর্হত মোঙ্গলী পুত্ত (মঙ্গলীপুত্র) পূজ্য মহিন্দকে সিংহলে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি সিংহলের ঐতিহ্য মতে বলেছিলেন—তুমি মনোহর লঙ্কাদ্বীপে মনোহর জিনানুশাসন দেখতে পাবে।

এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে সকল তথ্যর উল্লেখ সম্ভবপর নয়। এই শুভ উৎসবের সময় যাতে স্বাধীন ভারতের দৃষ্টি তার সোনালি যুগে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে এই পরিচয় পত্র। তথ্য এবং তত্ত্বর নির্ভুল বিবরণ ও অসম্ভব। কারণ এতাবত আমরা নিজের ঘরে দৃষ্টি দেবার সময় পাইনি।

মৌর্য্য এবং গুপ্ত বংশের রাজন্য বর্গের সাঁচির প্রতি অনুরাগ হ্রাস পায় নি। সাঁচির এক প্রস্তর লিপিতে দেখা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৪০১ খৃষ্টাব্দ) বৌদ্ধ থেরদের একটি গ্রাম দান করছেন। ককন দেবতার পবিত্র বিহার তিনি উৎসর্গ করে ছিলেন আর্য্য সঙ্ঘকে।

সারনাথের লুপ্তরত্নের মধ্যে পাওয়া সিংহশির স্তম্ভর চিত্র বর্ত্তমান ভারত সরকার মোহররূপে ব্যবহার করেছেন। সিংহশির স্তম্ভ সাঁচিতেও উদ্ধার হয়েছে। অন্যত্রও পাওয়া গেছে। সারনাথের স্তম্ভের চাক্‌চিক্য নয়নাভিরাম, সুতরাং এমন সুন্দর পদার্থ ভারতবাসীর পূর্ব পুরুষ নির্মাণ করতে পারে, এ অসম্ভব ধারণা আমাদের পাশ্চাত্য হ'তে আগত হিতার্থীদের মনে স্থান পেলে না। তাঁরা প্রাচীন ভুবন ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন। গ্রীকবাদীদের মত খণ্ডন করে এক দল মিশরে গেলেন। গ্রীসেতো সিংহ নাই। এ সিংহনির্মাতা নিশ্চয় মিশরের শিল্পী-কেশরী। কিন্তু মিশরের ভাস্কর্য্যেও তো সিংহমূর্ত্তি নাই। শেষে একদল রায় দিলেন যে ভারতের উত্তরে বক্তিরিয়ায় যে যবন উপনিবেশ ছিল তারই কেহ এ সৌন্দর্য্যের শ্রষ্টা। ভিনসেণ্ট স্মিথ পারস্যের ও গ্রীসের সম্মিলিত শিল্পের সন্ধান পেলেন। মনে পড়ে রোমক বিজয়ী বীরের কথা—উও টু দি ভ্যান্‌কুইস্‌ড—বিজিত সন্তপ্ত হ'ক।

যে চাকচিক্য বিদেশী মনকে বিস্মিত করেছে, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন সে বজ্রলেপের। তার রচনা প্রণালী

তন্ত্রে বিবৃত আছে। চিত্রশিল্পী হ্যাভেল অবশ্য পালিসে বাহিরের হাতের সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলেছেন।

সাঁচির বেষ্টনীতে ও ঐ রকম লেপ ছিল। কতক ম্লান হ'য়েছে। তবু তার অবশেষ লক্ষিত হয়। সারনাথের রেলিং পালিস করা ছিল। বরহুতেও লেপ বিদ্যমান। সুতরাং লেপ-বিদ্যা ভারতের শিল্পর এক বিভাগ, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা

ঐতিহাসিকদের মতানৈক্যের অপর একটি উদাহরণ দিই। সাঁচি সিংহলবাসীর পক্ষে পুণ্যভূমি কারণ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন ঐ প্রদেশের অধিবাসী রাজকুমার মহেন্দ্র এবং রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রা। কিন্তু এ কথা সত্য কিনা এবং মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্তা অশোকের কিরূপ আত্মীয় এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল বিতণ্ডায় ঐতিহাসিকদের লেখনী পরিচালিত করতে হয়েছিল। মহাবংশ সিংহলের ইতিহাস। তার মতে অশোকের পিতার রাজত্বকালে উজ্জয়িনী অবন্তীর রাজধানী ছিল। বিদিশ গিরিতে দেবী নাম্নী শ্রেষ্ঠী বংশীয়া এক মহিলা বাস করতেন। পিতার রাজত্বকালে যখন যুবরাজ অশোক এ প্রদেশে ছিলেন দেবীর সাথে তাঁর প্রেম হয়। তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। তারই গর্ভে মহেন্দ্রর জন্ম। দ্বীপবংশ মহেন্দ্রের জন্মকাল নিদের্শ করেছে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২০৪ বৎসর পরে। তার দুই বৎসর পরে সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করেন।

অশোকের রাজ্যলাভের পরও মহিষী দেবী বিদিশনগরে অবস্থিতি করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র কন্যা পিতার রাজধানী পাটলিপুত্রে গমন করলেন। অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্নিব্রহ্মার সঙ্গে সঙ্ঘমিত্রার বিবাহ হয়। সিংহলের রাজপুত্র দেবপ্রিয় তিস্‌সের অনুরোধে অশোক মহিন্দকে এবং পরে

সঙ্ঘমিত্রাকে লঙ্কায় প্রেরণ করেন। এঁরা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। লঙ্কেশ কন্যা আনুলা পাঁচ শত সহচরী নিয়ে সঙ্ঘ প্রবেশের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। নারীর দীক্ষা-গুরু নারী হলে শোভন হয়। সিংহল-রাজ আবার পাটনায় দূত পাঠান। তখন অশোক নিজ কন্যাকে বাঙ্‌লা দেশের তাম্রলিপ্তি বা তম্‌লুক অবধি পৌঁছে দেন। রাজকুমারী বোধি-দ্রুম সহ সিংহল গমন করেন এবং তথাকার রাজকুমারী এবং অন্যান্য মহিলাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

সাঁচির তোরণে যে উৎকীর্ণ চিত্র আছে তার ফলে এই বিবৃতি সত্য মনে হয়। সিলোনের থুপারাম স্তূপে মহেন্দ্রর ভস্মাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং মহাবংশ এবং দ্বীপ বংশের কাহিনীর সত্যতার এ দ্বিতীয় প্রমাণ।

ভারতবর্ষের প্রচলিত ঐতিহ্যে কিন্তু মহেন্দ্র এবং সঙ্ঘমিত্রা অশোকের ভ্রাতা ভগ্নী। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রথমে সমস্ত মহেন্দ্র সঙ্ঘমিত্তা আখ্যায়িকা কপোল কল্পিত ভেবেছিলেন। শেষে থুপারামে ভস্মাধার দেখে পরে বলেছেন ওঁদের দুজনকে তিনি স্বীকার করতে সম্মত হতে পারেন যদি তাঁরা অশোকের ভাইবোন হন। অবশ্য সময় কাল বিচার করে সিদ্ধান্তের কারণ দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বীল বলেছেন মহেন্দ্র সঙ্ঘমিত্রার সিংহল ভ্রমণ বৃত্তান্তটা একেবারে অলীক। নিজেদের ধর্মের সঙ্গে অতি প্রসিদ্ধ অশোকের নাম সংযোগ করার উচ্চাভিলাষই এই

কল্পনার জনক! হঠাৎ সমারোহে দেশটা বৌদ্ধ হয়ে গেল এ কি আবার একটা কথা। ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ সিংহলী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল।

ওল্‌ডেনবার্গ প্রভৃতি এক দল ইত্তিবৃত্তকারও মহেন্দ্র সঙ্ঘমিত্তার সিংহল গমন বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, এত অনুশাসন, শিলালিপি, গুহা লিপি প্রভৃতি চারিদিকে বিদ্যমান, তাদের কোনোটিতে তো অশোক ওদের সিংহল যাত্রার কথা লেখেন নাই। যে সকল দেশে অশোক প্রচারক পাঠিয়েছিলেন ত্রয়োদশ শিলা-লিপিতে তাদের নামের উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে সিংহলের নাম আছে বটে কিন্তু মহেন্দ্র বা সঙ্ঘমিত্রার উল্লেখ নাই।

অপর এক দলের মতে দক্ষিণ ভারত হতে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

জগতের সকল ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। বিজ্ঞান বাদী বলে পৃথিবীতে একটা আলপিন পড়লে নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তার সারা পড়ে। মানুষের মনের ভাব এবং সেই ভাব প্রণোদিত কাজের ও ফল ঐ রকম। আমরা মোটা কাজের স্থূল পরিণাম বুঝতে পারি। সূক্ষ্ম ভাবধারার প্রতি-ক্রিয়ার সূক্ষ্ম ফল ধরতে পারিনা। তাই ঐতিহাসিক মুনিদের নানা মত।

দেবতা বা মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা শিল্প প্রসারের কারণ। যাকে পৌত্তলিকতা বলে সেই ধর্মানুষ্ঠানের ফলে জগতে বহু

অট্টালিকা, ভাস্কর্য্য, চিত্র এবং মাটির পুতুল নির্মিত হয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী ফলে শিল্পদক্ষতা প্রসার লাভ করেছে। সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কায় বোধি বৃক্ষ নিয়ে গিয়েছিলেন। অশোক পথে ফল ফুলের বৃক্ষ রোপণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভক্তের হৃদয় কুসুম পৃথিবীতে প্রকৃতির যত্নে গড়া ফোটা ফুলের সন্ধান করছিল ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি-চৈত্যেতে, শান্ত মূর্ত্তিতে অর্ঘ্য দিবার জন্য। তার ফলে দেশে গাছের আদর বেড়েছিল। আজিও সিংহলের যে দিকে যাই, কুসুম সুবাস অভ্যর্থনা করে, চম্পক হাঁসে। মহামতি অশোক জীবে দয়া, গোরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুশাসন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার ফলে লোকের মনে গবাদি পশুর প্রতি প্রীতি জন্মেছে।

অশোকের আন্তর্জাতিকতার সুফলের অন্ত নাই। সার অরেল স্টীন বলেন প্রাচ্য তুর্কীস্থানে খোটানে খরোষ্টি অক্ষরে লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে যার ভাষা পালি। চীনে, মলয়ে, সিকিমে সিংহলে সংগ্রহ শালায় বহু সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লেখা পুঁথি পাওয়া গেছে। আজি ও মহাবোধি সোসায়টির সভায় তিব্বত চীন শ্যাম ও ব্রহ্ম হতে প্রতিনিধি এসে যখন ভ্রাতৃভাবে হাসে তখন প্রাণে সত্যই উদারতা আসে। ভবিষ্যতে দক্ষিণ ও পূর্ব এসিয়া আবার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এ আশা বহু দেশ-প্রেমিকের মনের পটে বিদ্যমান।

"রেলিক্" প্রত্যর্পণ

সাঁচি স্তুপের কথা আজ আবার সবার প্রসঙ্গের বিষয় হয়েছে, প্রভূ বুদ্ধের দুজন প্রধান ভক্তের ভস্মাধারের প্রসঙ্গে। প্রত্নতত্ব বিভাগ সাঞ্চী স্তুপগুলিকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দিয়েছে। তৃতীয় স্তুপে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে জেনেরাল কানিংহাম এই দুটি ভস্মাধার আবিস্কার করেন। এ দুটি ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া এণ্ড এলবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত ছিল। মহাবোধি সোসায়টির অক্লান্তকর্মী কর্মসচিব শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ বহু চেষ্টায় ভস্মাধার দুটি যাতে সাঁচিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে বিষয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লাভ করেছেন। সাঁচি ভূপাল রাজ্যের অন্তর্ভূত। তাই ভস্মাধার দুটি পাবার জন্য ভূপাল এক দাবী উপস্থাপিত করেছিল। শেষে মহাবোধি সোসায়টির পক্ষ হতে প্রধানেরা প্রভূত পরিশ্রমের ফলে বিলাত হতে স্মৃতি চিহ্ন দুটি সিংহলে আনিয়েছেন। যেরূপ সমারোহে গত সালে লঙ্কা সে দুটিকে গ্রহণ করেছে তেমন সমারোহ বা উৎসব এ যুগের সিংহলে অজ্ঞাত ছিল।

গত চৈত্র মাসে ভস্মাধার দুটি বর্মায় গিয়েছিল। সেখানেও বর্মীরা অসাধারণ ভক্তি দেখিয়েছে স্মৃতি চিহ্ন দুটির প্রতি। সে দুটি আবার সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় ভারতবর্ষের প্রধান সচিব পণ্ডিত শ্রীজহরলাল নেহেরু

সিলোন মহাবোধি সোসায়টির প্রতিনিধিদের হস্ত হইতে গ্রহণ ক'রে, কলিকাতার মহাবোধি সোসায়টির সভাপতি ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে ভস্মাধার দুটি সমর্পণ করবেন। সে সম্পর্কে যে উৎসব হবে বাঙ্‌লা সরকারের পক্ষ হতে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় ও মন্ত্রী শ্রীনিহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাশয়েরা তার বন্দোবস্ত করছেন। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য নাগরিক নিয়ে সরকার এক প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠন করেছেন। কর্মী শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর মহাশয়।

ভস্মাধার দুটির একটি সারিপুত্তের, অপরটি মহামোগ্‌গ-ল্লানের। এঁরা দুজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন প্রভু বুদ্ধভগবানের। যাঁদের বুদ্ধ সাক্ষাতকারের সৌভাগ্য হ'য়েছিল বলা বাহুল্য তাঁদের পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যের মাত্রা ছিল প্রভূত। এঁরা অর্হত্বলাভ করেছিলেন। তাই তাঁদের জন্মভূমি এবং সিংহল সারিপুত্ত এবং মহামোগ্‌গল্লানের পবিত্র স্মৃতিতে অর্ঘ দিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য বৌদ্ধ-প্রধান দেশেরও প্রতিনিধিরা এই স্মৃতি-পূজায় যোগদান করবেন। ভারতবর্ষের চিরদিনের নীতি—কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি। তাই আজ তাঁদের কীর্ত্তির মাঝে সারিপুত্র এবং মহামোদ্গল্যায়ন অমর।

এই প্রক্ষেপই মনুষ্যত্বর উৎকৃষ্ট উপলব্ধি। সে শিক্ষা এ পুণ্য ভূমির সকল কৃষ্টি, সকল সাধনার মূলে। মানুষের একতা কেবল জীবিত আত্মীয়র সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে

ঐক্য বোধ নয়। যারা গেছে বর্ত্তমানে নিজেদের মধ্যে তাদের উপস্থিতি মেনে নিয়ে তাদের প্রতি দরদ বা শ্রদ্ধা, উদার বিশ্ব-মানবতার লক্ষণ। যাঁরা কীর্ত্তি রেখে দেহত্যাগ করেছেন, সুখের কিরণ ছড়িয়ে অতীতে বিলীন, তাঁদের জন্য মন কাঁদে। তাই সমাজে সহীদ ও বীরের পূজা, সুখের স্মৃতি জড়ানো বিগত দিনকে উপলক্ষ ক'রে পার্বণ ও উৎসব।

ভারতের সুখের রবি বহুদিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তার সংস্কৃতি উদারতার ভিত্তিতে গড়া, তাই সে আজিও জীবিত। আজ ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ স্বাধীন। বহুদিন আশায় ঊর্দ্ধপানে চেয়েছিল, শুভদিনের প্রতীক্ষায়। কবির ভাষায়—

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধ পানে চাহি। ওহে নাথ
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখা প্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দ মর্মর
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তর।

আজ সে পথিক পবন আগত।

চিত্ত-প্রসার

মানুষ চায় সঙ্গ, নিজের মনের মত লোক নিয়ে গড়তে চায় সঙ্ঘ। এই দল-বাঁধার প্রবৃত্তি তাকে একদিকে যেমন বাড়িয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষুদ্র করেছে। ধর্ম্মের নামে স্রষ্টার নামে এক হ'য়ে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে, মানুষ যখন নিজের সংহতির গণ্ডীর অপরপারের লোককে ঘৃণা করে, শত্রু ভাবে, তখন তার অধঃপতন। কিন্তু একত্র সমাহিত হয়ে সে যখন স্থির করে যে সঙ্ঘ পরসেবার অনুষ্ঠান, তার বাঁধা দল বিশ্ব-মানবতার হিত-কামনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন মানব-মন প্রসারিত হয়। নিজের লাভকে ক্ষুদ্র ভাবলে, চরম লাভের মাত্রা বিশাল হয়। ক্ষুদ্র বস্তুভার মন ভূতের বোঝা বহে মাত্র।

এ দেশের নীতি চিরদিন ঐ সঙ্কীর্ণতার বিপক্ষে সংগ্রাম রত। ভগবান বুদ্ধ বহুর হিত-কল্পে নিজের নির্বাণ ত্যাগ করেছিলেন। মহারাজা অশোক পৃথিবীর বস্তুলাভ ক'রে হাঁসি মুখে সে ভার আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ ক'রে মহাপ্রাণদের স্মৃতি মন্দিরে স্তূপ উৎসর্গ করেছিলেন।

কবির কথায়—

> বস্তু ভারহীন মন সর্ব জলে স্থলে
> পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
> জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
> পশিত আত্মীয়রূপে।

আজ সেই মাভৈঃ মন্ত্র ভেসে এসেছে। আজ প্রাচ্যদেশ স্বাধীন! সেই সুখের স্বাধীনতা আজ সমারোহের বিপুল বর্ষণে আমাদের মানসপটে এনে দেবে তাঁদের স্মৃতি যাঁরা এই ভারতভূমির জন্য পুণ্যভূমি বিশেষণ অর্জন করবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজ এই শুভ পূর্ণিমার দিনে তাঁর প্রিয় শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অবকাশে সিদ্ধার্থকে বলি—

নূতন তব জনম লাগি কাতর যত প্রাণী
মহাপ্রাণ কর ত্রাণ আন অমৃত বাণী।

মাতা গোতমীর কথায় বলি—

বুদ্ধবীর নমোত্যত্থু সব্বসত্তানমুত্তমম্।